সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ২৫-২৬
০৬ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার

ইসতিকলাল মাসজিদ, জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

সূচীপত্র

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আলোয়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

২৫-২৬ সংখ্যা
০৬ এপ্রিল-২০২৬ ঈসায়ী
২৩ চৈত্র-১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৭ শাওয়াল-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

- মণির খনি: এক নজরে হজ্জ ০২
- সম্পাদকীয়: ত্রিমুখী সংঘাতের অভিঘাত: জ্বালানি সংকট ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ০৪
- উপ-সম্পাদকীয়: কখন ফুটবে আত্মজাগরণের ভোর ০৫
- দারসুল কুরআন– আলোর পথে যাত্রা : আল্লাহভীরুর গুণাবলি — আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৭
- দারসুল হাদীস: মৃত্যুর স্মর — গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১২
- মসজিদে নব্বীর খুত্ববাহ্: রমযানের পরেও নেক 'আমলের উপর অবিচল থাকা — খত্বীব : শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসিম (হাফিযাহুল্লাহ) অনুবাদক : শাইখ ড. হারুনুর রশিদ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ)- ১৬
- প্রধান রচনা: ইসলামী শব্দাবলী : মানব আত্মার চাবিকাঠি — মীর লুৎফুল কবির সা'দী- ১৮
- ইসলামী প্রবন্ধ: পবিত্র হজ্জ ভ্রমনে সুবিধা, অসুবিধা ও করণীয় — ডা. সুলতান আহমদ- ২১
- এক নজরে 'উমরাহ্ এবং হজ্জ — জান্নাতুল মহল- ২৩
- কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব — মো. মনিরুজ্জামান- ২৫
- আলোকিত জীবন– ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম — ড. আহমাদুল্লাহ- ২৮
- নিভৃত ভাবনা: ভূলুণ্ঠিত মানবতা ও কফিনবন্দী সভ্যতা — আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩০
- সমাজচিন্তা– পহেলা বৈশাখ: সংস্কৃতি না-কি চাপিয়ে দেয়া অপসংস্কৃতি! — মো. আব্দুল হাই- ৩১
- কবিতা ৩৬
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৮
- প্রচ্ছদ পরিচিতি– ইসতিকলাল মসজিদ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা — আবু ফাইয়ায- ৪৬
- মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা) ৪৭

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি: এক নজরে হজ্জ

আল্লাহ তা'আলার বাণী

۞ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

✽ "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরাহ্ পূর্ণভাবে আদায় করো।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৬)*

۞ ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

✽ "হজ্জ নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এ মাসগুলোতে হজ্জের সংকল্প করে, তার জন্য হজ্জে স্ত্রীসহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৭)*

۞ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

✽ "আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফর্‌য– যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।" *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ৯৭)*

۞ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ﴾

✽ "তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং দূর-দূরান্ত থেকে ক্ষীণকায় উটের পিঠে চড়ে।" *(সূরা আল-হজ্জ: ২৭)*

۞ ﴿لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ﴾

✽ "যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানে উপস্থিত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।" *(সূরা আল-হজ্জ: ২৮)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

ধাপ– ০১: হজ্জের নিয়ত (ইহরাম) করা। হুকুম: ফরয (রুকন)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

অনুবাদ: সমস্ত 'আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ সেটাই পাবে, যা সে নিয়ত করে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৭)*

হজ্জের নিয়ত (ইহরাম) করার নিয়ম

হজ্জ বা 'উমরার সফরে ইহরাম অবস্থায় প্রবেশ করা (নিয়ত করা) ফর্‌য। এটি হজ্জ/'উমরার প্রথম ধাপ।

১. ইহরামের পোশাক: পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন দুই টুকরা কাপড়। নারীদের জন্য সাধারণ শালীন পোশাক (মুখ খোলা রেখে পর্দা বজায় থাকবে)।

২. নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ: মিকাতে পৌঁছে নিয়ত করতে হবে।

'উমরার জন্য: اَللّٰهُمَّ لبيك عمرةً.

এবং **হজ্জের জন্য:** اَللّٰهُمَّ لبيك حجًا.

এরপর **তালবিয়া পাঠ** করতে হবে:

لبيك اللّٰهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

মীকাত কী?

মীকাত হলো সেই নির্ধারিত সীমারেখা, যেখান থেকে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। যারা বাইরের দেশ থেকে আসেন, তাদের এই সীমা অতিক্রম করার আগেই ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে দম (কুরবানী) দিতে হয়। বাংলাদেশ থেকে বিমানে হজ্জ/'উমরায় গেলে "কারনুল মানাযিল" মীকাত অতিক্রম করে।

ধাপ– ০২: তালবিয়া পাঠ করা। হুকুম: সুন্নাত

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ: লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নি'আমাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা-শারীকালাকা।

অর্থ: আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোনো অংশীদার নেই; আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই এবং রাজত্বও আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৪৯)*

ধাপ– ০৩: হাজরে আসওয়াদ চুম্বন/স্পর্শ করা। হুকুম: সুন্নত

كَانَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন/স্পর্শ করতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৬১৩)*

ধাপ– ০৪: সাফা-মারওয়া সাঈ করা। ফরয (রুকন)

اَسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

অনুবাদ: তোমরা (সাফা-মারওয়া) সাঈ' করো; আল্লাহ তা তোমাদের উপর নির্ধারণ করেছেন। *(মুসনাদ আহমাদ- সহীহ)*

ধাপ– ০৫: মিনায় অবস্থান করা। হুকুম: সুন্নত

فَخَرَجَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) (৮ যিলহাজ্জ যুহরের পূর্বে) মিনায় গমন করেন ও সেখানে সালাত আদায় করেন (এবং ৯ যিলহজ্জ ফযর পর্যন্ত অবস্থান করেন)। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)*

ধাপ– ০৬: আরাফাতে অবস্থান করা। হুকুম: ফরয (রুকন)

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ.

অনুবাদ: হজ্জ হলো আরাফা। *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৮৮৯, সহীহ)*

(৯ যিলহাজ্জ আরাফার ময়দানে ইমামের পিছনে যুহর-আসর জমা'-কসর করে খুতবা শ্রবণ করা এবং মাগরিবের আযান পর্যন্ত অবস্থান করা)।

ধাপ– ০৭: মুযদালিফায় রাত্রি যাপন। হুকুম: ওয়াজিব

وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) মুযদালিফায় অবস্থান করেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)*

(৯ যিলহজ্জ আরাফাহ থেকে মুজদালিফায় গমন করে মাগরিব-ইশা জমা' করা এবং সেখানে রাত্রি যাপন করা)।

ধাপ– ০৮: জামারায় রমী (পাথর নিক্ষেপ) করা। হুকুম: ওয়াজিব

رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৫১; সহীহ মুসলিম- হা. ১২৯৬)*

(১০ যিলহজ্জ বড়ো জামারায় ০৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা)।

ধাপ– ০৯: হাদী (কুরবানী) করা। হুকুম: ওয়াজিব

نَحَرَ النَّبِيُّ (ﷺ) هَدْيَهُ.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) তাঁর কুরবানী জবেহ্ করেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭১২)*

ধাপ– ১০: তাওয়াফ (ইফাযা)। হুকুম: ফরয (রুকন)

فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) কাবাকে ঘিরে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)*

ধাপ– ১১: মাথা মুণ্ডানো/চুল কাটা। হুকুম: ওয়াজিব

اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ.

অনুবাদ: হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডায় তাদের উপর রহমত বর্ষণ করো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০১)*

ধাপ– ১২: মিনায় অবস্থান (১১-১২-১৩ যিলহজ্জ) করা। হুকুম: ওয়াজিব

كَانَ يَبِيْتُ بِمِنًى.

অনুবাদ: নবী (ﷺ) মিনায় রাত যাপন করতেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১২১৮)*

ধাপ– ১৩: তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। হুকুম: সুন্নত

(১১-১২-১৩ যিলহজ্জ মিনায় অবস্থানকালে তিনটি জামারায় ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা)।

ধাপ– ১৪: বিদায়ী তাওয়াফ। হুকুম: ওয়াজিব

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ.

অনুবাদ: মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাদের শেষ কাজ হয় কাবা তাওয়াফ করা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৫৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩২৮)*

উল্লেখ্য যে, হজ্জের কোনো একটি রুকন বা ফরয ছুটে হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে দম বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পশু যবেহ করতে হবে।

افتتاحية / সম্পাদকীয়

ত্রিমুখী সংঘাতের অভিঘাত: জ্বালানি সংকট ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনা সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক রাজনীতিকে এক অনিশ্চিত মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রতিবেদন বলছে, এই সংঘাত শুধু আঞ্চলিক নিরাপত্তা নয়; বরং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে– যার সরাসরি অভিঘাত পড়ছে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশগুলোর ওপর।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের যৌথ হামলার পর ইরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পারস্য উপসাগরজুড়ে অভাবনীয় অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী –যা দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবাহিত হয়– সেখানে জাহাজ চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, এই সংকটের কারণে তেল সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেছে এবং বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে।

তেলের দামের এই ঊর্ধ্বগতি ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন, এমন পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ১৫০ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী মন্দার ঝুঁকি তৈরি করবে।

এদিকে ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে গ্যাসের দামও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা জ্বালানি সংকটকে আরো তীব্র করছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক। জাতীয় দৈনিকগুলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে দেশের আমদানি ব্যয় ও বাণিজ্য খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে জাহাজ পরিবহন খরচ বেড়েছে এবং বিকল্প রুট ব্যবহারের কারণে সময় ও ব্যয় উভয়ই বাড়ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সতর্ক করে বলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ১০ ডলার তেলের দাম বাড়লে বাংলাদেশের মাসিক আমদানি ব্যয় ৭০-৮০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি পরিবহন ব্যয় বাড়াচ্ছে, শিল্প উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং শেষ পর্যন্ত নিত্যপণ্যের দামে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা প্রবল হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো কঠিন করে তুলতে পারে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে এখন ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ –একদিকে বৈশ্বিক সংকটের অভিঘাত সামাল দেওয়া, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। তৃতীয়ত, দেড়মাস বয়সী নতুন সরকারের ভাবমূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এজন্য কয়েকটি কৌশল জরুরি।

প্রথমত, জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ এখন আর বিলাসিতা নয়; বরং অপরিহার্য। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, এলএনজি এবং আঞ্চলিক জ্বালানি সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো এবং অপচয় রোধে কার্যকর নীতি গ্রহণ জরুরি।

তৃতীয়ত, নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে মূল্যস্ফীতির ধাক্কা তারা সামাল দিতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা, এই সংকট একটি সতর্কবার্তা– বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে আরো পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। বৈশ্বিক রাজনীতির গতিপথ আমাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও, তার প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া সম্পূর্ণই আমাদের হাতে।

অতএব, ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল সংঘাত শুধু একটি ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। এখন প্রশ্ন একটাই– আমরা কি এই সংকটকে সুযোগে রূপান্তর করতে পারব, নাকি অপ্রস্তুত অবস্থায় এর অভিঘাতে দিশেহারা হব?

مَقَالُ الرَّأْيِ / উপ-সম্পাদকীয়ঃ

কখন ফুটবে আত্মজাগরণের ভোর

‘এ এক চিরন্তন সত্য! মানুষ অভ্যাসের অনুগত।’ অবিরত চর্চার ফলে যে কোনো কাজ ধীরে ধীরে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, তা আর আলাদা করে ভাবার অবকাশ থাকে না; বরং সেটিই হয়ে ওঠে তার নিত্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই মানবিক বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ্য করে পবিত্র রমাযান আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। নিছক একটি ধর্মীয় আচার হিসেবে নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, সংযম ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের এক মহৎ প্রশিক্ষণক্ষেত্র হিসেবে।

রমাযানের দিনগুলোতে মানুষের ভেতরে যেন এক অনাবিল জাগরণ ঘটে। ‘ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, হৃদয় কোমল হয়, আত্মা হয় সংবেদনশীল। সলাতে মনোযোগ, কিয়ামুল লাইলের প্রতি আগ্রহ, কুরআনের প্রতি আকর্ষণ, দান-সাদাক্বার প্রবণতা– সব মিলিয়ে জীবনে এক ভিন্নতর ছন্দ অনুভূত হয়। এমনকি মানুষ শুধু হারাম থেকেই নয়, অনেক সময় বৈধ ভোগ-বিলাস থেকেও নিজেকে সংযত রাখে একমাত্র প্রভুর সন্তুষ্টির আশায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই আলোকোজ্জ্বল পরিবর্তন যেন রমাযানের বিদায়ের সাথেই সাঙ্গ হয়। রমাযানের চাঁদ অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অন্তরের সেই আলোও ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে।

এ বাস্তবতা আমাদের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে! আমাদের সাধনা কি তবে ছিল ক্ষণস্থায়ী, আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র? যদি তা সত্যিকারের আন্তরিকতা ও গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হতো, তবে কি তা এত সহজে ম্লান হয়ে যেত? প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অনেক ‘আমলই হয় বাহ্যিক; অন্তরের সম্পৃক্ততা সেখানে প্রায়শই অনুপস্থিত। আর হৃদয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সাধনাই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর তা আরশে আযীমেও পৌঁছে না।

পরম করুণাময় আল্লাহ মানবমনের এই দুর্বলতা সম্যক অবগত। তাই তিনি রমাযানের পরেও আমাদের জন্য রেখেছেন অব্যাহত সাধনার পথ। শাওয়াল মাসের ছয়টি সওম যেন রমাযানেরই একটি সম্প্রসারণ; সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার, কিংবা (মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫) আইয়ামে বীয– এসবই ‘ইবাদতের ধারাবাহিকতা রক্ষার সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী উপায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ ও ব্যস্ততার আবর্তে আমরা এই অনুপম সুযোগগুলো উপেক্ষা করি এবং ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলি আত্মিক উন্নতির সেই সোনালি সম্ভাবনা।

আজকের মানুষ যেন এক অন্তহীন মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে– যেখানে প্রাপ্তির ভ্রম আছে, কিন্তু প্রকৃত সাফল্য নেই। আমরা ক্ষণিকের তৃপ্তির বিনিময়ে চিরস্থায়ী কল্যাণ বিসর্জন দিচ্ছি, অথচ তা উপলব্ধি করার মতো সচেতনতা আমাদের মাঝে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

অতএব, সময় এসেছে আত্মসমালোচনার। নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে হবে– কবে জাগ্রত হবে আমাদের অন্তর? কবে আমরা অনুধাবন করব যে, ‘ইবাদত কোনো নির্দিষ্ট সময়ের আবদ্ধ আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন জীবনপদ্ধতি?

আত্মজাগরণের সেই কাঙ্ক্ষিত ভোর হঠাৎ করেই আসে না; তা ধীরে ধীরে প্রস্ফূটিত হয়, নিয়মিত ছোটো ছোটো ‘আমলের মাধ্যমে, আন্তরিক অনুশোচনা ও প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। যে হৃদয় বারবার তার প্রভুর দিকে ফিরে আসে, তার জন্যই একদিন সত্যিকারের ভোরের আলো উদ্ভাসিত হয়। অতএব, ভোরের প্রতীক্ষায় স্থির না থেকে– আসুন, আমরা নিজেরাই সেই ভোরের সূচনা করি, অন্তরের গভীর থেকে গভীরে।

রমাযানের আলোয় নবযাত্রা: রমাযান ছিল আত্মশুদ্ধির এক মহাসমারোহ, আত্মগঠনের এক অনন্য কর্মশালা। রমাযানে 'ইবাদতের যে স্বাদ আমরা অনুভব করি, তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি। পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতি যত্ন, কুরআনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, যিক্র ও দু'আর মাধ্যমে হৃদয়ের পবিত্রতা– এসবই হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাঝে মাঝে কিয়ামুল লাইল আদায়ের মাধ্যমে আমরা লাইলাতুল কদরের সেই গভীর, পবিত্র চেতনার সঙ্গে নিজেদের পুনরায় যুক্ত করতে পারি। নির্জন রাতের নীরবতায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের আশায় ধ্যানমগ্ন থেকে ইতিকাফের সেই আত্মিক অনুশীলন আমাদের অন্তরকে করে তুলতে পারে আরও প্রশান্ত ও আলোকিত।

রমাযান আমাদের দানশীলতা শিখিয়েছে। সেই শিক্ষা যেন সীমাবদ্ধ না থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে; বরং দান-সাদাক্বার হাত প্রসারিত হোক সারা বছর। অসহায়, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের ঈমানেরও দাবি। একই সঙ্গে "আম্র বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার" নতুন উদ্যমে গ্রহণ করতে হবে, যাতে সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিবার হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধ চর্চার প্রথম পাঠশালা। পরিবারে সলাত, কুরআন তিলাওয়াত ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা আমাদের কর্তব্য। পাশাপাশি প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব সমাজকে করে তুলতে পারে আরও মানবিক ও সংহত।

সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আজ সময়ের দাবি। বিভাজন নয়, ঐক্য; বিদ্বেষ নয়, ভালোবাসা– এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করাও এ সময়ের অন্যতম প্রয়োজন। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দেশপ্রেমের চর্চা আমাদের জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে।

পরিশেষে বলা যায়, রমাযান আমাদের যে আলোর পথ দেখিয়েছে, সেই পথেই অবিচল থাকা আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। যদি আমরা এই শিক্ষাগুলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র– সব ক্ষেত্রেই আসবে ইতিবাচক পরিবর্তন। রমাযানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই নবযাত্রাই হোক আমাদের অটুট প্রতিজ্ঞা।

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

আলোর পথে যাত্রা : আল্লাহভীরুর গুণাবলি

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। তারাই তাদের রব-এর নির্দেশিত হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

, অর্থ- আর/এবং, اَلَّذِيْنَ অর্থ- যারা, يُؤْمِنُوْنَ তারা ঈমান আনে, بِمَآ অর্থ- তার প্রতি- যা, اُنْزِلَ অর্থ- নাযিল করা হয়েছে, اِلَيْكَ অর্থ- তোমার প্রতি, , অর্থ- আর/এবং, اُنْزِلَ অর্থ- নাযিল করা হয়েছে, مِنْ قَبْلِكَ অর্থ- তোমার পূর্ববর্তীদের উপর, بِالْاٰخِرَةِ ; এবং আখিরাতের প্রতি, هُمْ অর্থ- তাদের, يُوْقِنُوْنَ অর্থ- দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, اُولٰٓئِكَ অর্থ- এরাই, عَلٰى অর্থ- উপরে, هُدًى অর্থ- হিদায়াত বা আলোর পথ, مِّنْ رَّبِّهِمْ অর্থ- তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত, , অর্থ- আর/এবং, اُولٰٓئِكَ অর্থ- এরাই, هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থ- যারা সফলতা অর্জন করেছে।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত তিনটি আয়াত মহা গ্রন্থ আল- কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহত্তম সূরা আল-বাক্বারাহ্ হতে চয়ন করা হয়েছে। এটি সূরা আল-বাক্বারার তিন, চার ও পাঁচ নং আয়াত।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

আলোচ্য আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মদীনায় হিজরতের পর যখন মদীনায় মুসলিমদের পাশাপাশি ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকদের বসবাস ছিল। তখন কুরআন এ তিন শ্রেণীর মধ্যে কার জন্য হিদায়াত বা আলোর পথস্বরূপ আর কারা এর থেকে উপকৃত হতে পারবে, তা স্পষ্ট করার জন্য এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। মদীনার ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের প্রতি সংশয় পোষণ করত। তাই চার (৪) নং আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত মু'মিন হতে হলে কুরআন এবং পূর্ববর্তী কিতাব উভয়টিতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। মক্কার কাফিররা যা চোখে দেখে না তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করত। তাদের বিপরীতে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'অদৃশ্যে বিশ্বাস' বা ঈমান বিল গায়েবের গুরুত্ব বোঝাতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾

"যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে।"

ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতাংশে মুত্তাক্বীদের একটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মুত্তাক্বীগণ অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে। إيمان শব্দের শাব্দিক অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে সত্য বলে মেনে নেওয়া। যেমন- কুরআনে উল্লেখ রয়েছে নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইয়েরা তাদের পিতাকে লক্ষ্য করে বলেছিল–

﴿وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ﴾

অর্থ- "আর আপনি আমাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী হই।"[২]

---

* *সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৩-৫।*

[২] *সূরা ইউসূফ : ১৭।*

ঈমানের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুফাস্সির ও ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন– সত্য বলে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। রাবী' ইবনু আনাস বলেন– ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা'। ইমাম যুহরী বলেন, 'আমলকে ঈমান বলা হয়'। ইমাম গাজালী (রহিমাহুল্লা-হু) বলেন, 'রাসূল (ﷺ)-এর আনীত সকল বিধি-বিধানসহ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান'। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লা-হু) বলেন, 'আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিই হলো ঈমান'। ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লা-হু)-সহ অনেকেই ঈমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে–

أَنَّهُ تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও (ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ) কাজে পরিণত করার নাম ঈমান।[৩]

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, এসব মতের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এগুলোর একই অর্থ।

غيب শব্দের অর্থ- অদৃশ্য, অনুপস্থিত ও গোপন বস্তু। ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন এর ভাবার্থ হচ্ছে– ঐসব গোপনীয় জিনিস যা দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। যেমন- জান্নাত ও জাহান্নাম। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আরো বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত'। ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালিদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, غيب হচ্ছে ইসলামের সমুদয় গোপনীয় বিষয়সমূহ। যায়েদ ইবনু আসলাম (রহিমাহুল্লা-হু) বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে– ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন'। 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ বলেন, 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীই হচ্ছে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।'

إيمان بالغيب **বা অদৃশ্যে বিশ্বাস:** إيمان ও غيب একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ﴾

অর্থ- "যে ব্যাক্তি দয়ালু আল্লাহকে না দেখে ভয় করেছে। সে আল্লাহর দিকে আসে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে।"[৪]

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত যেমন- সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ১৩৬, ১৭৭, ১৮৫; সূরা আল-ক্বামার-এর ৪৯; সূরা আন্-নিসা'র ১৩৬ নং আয়াত থেকে বুঝা যায়, ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টির নাম ঈমান। আর এই মৌলিক ছয়টি বিষয়ই غيب বা অদৃশ্য। إيمان بالغيب বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের মূল পরিচয় একটি হাদীসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন যে, একবার জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) মানুষের আকৃতিতে রাসূল (ﷺ)-এর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈমান কি? তিনি উত্তরে বললেন: মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশ্তাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি, তাঁর সাক্ষাতের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং শেষ দিবসে পুনরুত্থান ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান।[৫] প্রত্যেক ধর্মেই এই অদৃশ্যে বিশ্বাসের কথা রয়েছে। বর্তমানে কিছু অর্বাচীন এই অদৃশ্যে বিশ্বাসকে অস্বীকার করে। তারা বলে, 'যা দেখি না নিজ নয়ণে বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে'। তাদের কল্পিত এই শ্লোকটি ডাহা মিথ্যা ও অযৌক্তিক। অনেক কিছুকেই না দেখে বিশ্বাস করতে হয়। ব্যাথা- বেদনা দেখা যায় না, দেখা যায় না মানুষের অনুভূতি ও কল্পনা, দেখা যায় না পিতা-পুত্রের সম্পর্কের উৎস। কিন্তু তারপরেও বিবেকবান প্রত্যেকটি মানুষ এগুলো বিশ্বাস করে। আসলে অদৃশ্যে বিশ্বাস এটি মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনুল কারীমে এই غيب (অদৃশ্য) শব্দ দ্বারা সে সকল বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যার সংবাদ স্বয়ং রাসূল (ﷺ) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সকল বিষয় নিজ বুদ্ধিতে ও ইন্দ্রিয় গ্রাজ্য অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। গায়েব শব্দটির মাধ্যমে ঈমানেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা সিফাত বা গুণাবলী এবং তাক্বদির সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহাশ্ত, দোযখ, কিয়ামত, ফেরেশ্তা, আসমানী কিতাবসহ সকল নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ﴾

অর্থ- "প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশ্তাকুল, কিতাবসমূহ ও তার রাসূলগণের উপর।"[৬]

না দেখে বিশ্বাসের গুরুত্বই বেশি। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'যাঁরা রাসূল (ﷺ)-কে দেখেছেন তাঁদের তো কর্তব্যই হলো তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁরাই উত্তম যাঁরা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন।[৭]

---

[৩] *শারহুল ফিকহিল আকবার- মোল্লা 'আলী ক্বারী, পৃ. ১৪১-১৫০।*
[৪] *সূরা ক্বা-ফ : ৩৩।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০।*
[৬] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৮৫।*
[৭] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾ "আর তারা সলাত ক্বায়েম করে।"

ব্যাখ্যাঃ يُقِيْمُوْنَ শব্দটি اقامة শব্দমূল থেকে এসেছে। اقامة অর্থ হচ্ছে– কোনোকিছুকে সঠিকভাবে সঠিক স্থানে রাখা, বাঁকা কাঠকে তাপদিয়ে সোজা করা বা প্রতিষ্ঠা করা। আর الصَّلٰوةَ শব্দটির অর্থ- নামায, প্রার্থনা বা বিনয়ী হয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা। ব্যাবহারভেদে শব্দটি চারটি অর্থ প্রকাশ করে। যথা-

১. শব্দটি যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্রষ্টার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন এর অর্থ হবে- দয়া ও অনুগ্রহ। **২.** শব্দটি যদি রাসূল (ﷺ)-এর উদ্দেশ্যে কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন এর অর্থ হবে– দূরূদ পাঠ করা। **৩.** শব্দটি যদি শ্রষ্টার উদ্দেশ্যে ফেরেশ্তাদের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন এর অর্থ হয় তাসবীহ্ পাঠ আর কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ফেরেশ্তাদের সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে– ঐ ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা **৪.** এবং শব্দটি যদি মানুষের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তখন এর অর্থ হয়- নামায বা বিনয়ী হয়ে প্রার্থনা করা।

এখানে যেহেতু বান্দার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাই এর অর্থ হবে। তারা নামায ক্বায়েম করে। আর এই ক্বায়েম বা ইক্বামাতে সালাত দু'ভাবে হতে পারে। যথা-

১. শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মে, নির্ধারিত সময়ে, ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদাহ্ ও তাশাহুদের মাধ্যমে প্রতিটি আরকান ও আহকাম পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اَرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ﴾

অর্থ- "আর তোমরা রুকূ'উ করো ও সিজদাহ্ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত করো।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

অর্থ- তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।[৯]

২. নিজে সালাত আদায় করা, পরিবার ও সমাজে সামগ্রিকভাবে সলাত আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। মুসলমানদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা, অধিনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সন্তানদের জোড়ালো নির্দেশনার মাধ্যমে দায়িত্ব নিয়ে সালাত আদায় করার চেষ্টা করাই হলো সালাত ক্বায়েম করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

[৮] *সূরা আল-হাজ্জ : ৭৭।*
[৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩১ ও ৬০০৮।*

অর্থ- "আর তোমরা পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকো।"[১০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

"এবং তাদেরকে রিয্ক হিসেবে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে ব্যায় করে।"

ব্যাখ্যাঃ কুরআনুল কারীমে সাধারণত নফল দান-সাদাক্বার জন্য صدقة শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফর্য দান-সাদাক্বার ক্ষেত্রে زَكٰوةَ শব্দটি ব্যবহার হয়। আর يُنْفِقُوْنَ শব্দটির অর্থ ব্যাপক। যাতে ফর্য ও নফল উভয় প্রকারের দান-সাদাক্বাই শামিল। এখানে এর দ্বারা ফর্য যাকাত, ওয়াজিব সাদাক্বাহ্ এবং নফল দান-সাদাক্বাহ্ প্রভৃতি যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে।[১১] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

এর অর্থ হচ্ছে– "যাকাত আদায় করা।" ইমাম ইবনু জারীর বলেন, এর দ্বারা যাকাত, সন্তান সন্ততির জন্য খরচ এবং নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় ও যেসব লোককে দেয়া প্রয়োজন, এসব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী বলেন, এটি যাকাতের হুকুমের পূর্বেকার আয়াত। এর অর্থ হচ্ছে– সন্তান সন্ততিকে পানাহার করানো। যাহ্হাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সূরা আত্-তাওবাহ্'র মধ্যে যাকাতের যে সাতটি আয়াত আছে তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে, বান্দা যেন নিজ সাধ্য অনুযায়ী কমবেশি কিছু দান করতে থাকে।[১২] ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পার্থিব এই ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানত, খুব শীঘ্রই এটা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং সময় থাকতেই তা ব্যয় করো। আর এই ব্যয় প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবেই করা যাবে। আল্লাহ বলেন–

﴿وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً﴾

অর্থ- "আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।"[১৩]

কুরআনুল কারীমে ব্যয় করার এই নির্দেশ দিয়ে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, এই ব্যয় দরীদ্রের উপর অনুকম্পা নয়; বরং এটা তাদের অধিকার। যেমন- আল্লাহ বলেন–

﴿وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾

[১০] *সূরা ত্বা-হা- : ১৩২।*
[১১] *তাফসীর তাবারী।*
[১২] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[১৩] *সূরা আর্-রা'দ : ২২।*

অর্থ- "আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার।"[১৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ- আল-কুরআনের প্রতি ঈমান, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো একথা বিশ্বাস করা যে, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী কিতাব এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সমর্থক, সংরক্ষক ও ব্যাখ্যাকারক। আল্লাহ সুব্হা-নাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

অর্থ- "আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষক।"[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন–

﴿وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ﴾

অর্থ- "আর পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এই (কুরআন) তার সমর্থক এবং বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাকারক।"[১৬]

এই কুরআন কখনো কোনোরূপ বিকৃত হবে না কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ সুব্হা-নাহু ওয়া তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন–

﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴾

অর্থ- "নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।"[১৭]

সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র এই কুরআনের বিধি-বিধান ও আদেশানুযায়ীই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো– এই কথা বিশ্বাস করা যে, সেগুলো সত্য ও হক্ব এবং সে যুগে এর উপর 'আমল করা আবশ্যিক ছিল। সেই কিতাবগুলো বর্তমানে আসল (অপরিবর্তিত) অবস্থায় পাওয়া যায় না। আহলে কিতাবদের কতিপয় স্বার্থবাদীদের দ্বারা কিতাবগুলোর বিকৃত সাধিত হয়েছে। তাই সেগুলোর উপর এখন আর 'আমল করা যাবে না। পূর্ববর্তী এই কিতাবসমূহের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাওয়ার কারণেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, কিতাব ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা কুরআন ও রাসূল (ﷺ) পর্যন্তই শেষ। তা না হলে তার পরে আগত কোনো কিতাব ও রিসালাতের উপর ঈমান আনার কথাও আল্লাহ সুব্হা-নাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

ব্যাখ্যা: মুজাহিদ, আবূল আলিয়া ও ক্বাতাদাহ্সহ কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদি বিশেষণ পূর্বে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জন্যই দ্বিতীয়বার এই বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ- ঈমানদার চাই সে আরবের মু'মিন হোক বা আহলে কিতাব। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে– আহলে কিতাব। আর الْاٰخِرَة অর্থ- পরকাল। দুনিয়া ধ্বংসের পরে আসবে বলে তাকে الْاٰخِرَة বলা হয়। এখানে কিয়ামত, পুনরুত্থান, মীযান, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি বুঝাতে الْاٰخِرَة শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। এই আখিরাতকে যারা বিশ্বাস করে না। তারা দিকভ্রান্ত হয়ে দুনিয়ার জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে। আল্লাহ বলেন–

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ﴾

অর্থ- "নিশ্চয় যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য তাদের কাজকে আমি সুশোভিত করেছি। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।"[১৮]

এ জন্যই তারা সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা অসামাজিক, জীবনের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেসব অনাচারে লিপ্ত হয়। অপরাধ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সাধারণত আইনের শাস্তিও তাদের দাত-সওয়া হয়ে যায়। তাদের মধ্যে শাস্তিকে যারা ভয় করে তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না

[১৪] *সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ১৯।*
[১৫] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৮।*
[১৬] *সূরা ইউনুস : ৩৭।*
[১৭] *সূরা আল-হিজ্র : ৯।*
[১৮] *সূরা আন্-নামল : ৪।*

সেখানে যে কোনো গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোনো বাধাই থাকে না। পক্ষান্তরে যারা পরকালকে বিশ্বাস করে। তারা জানে সেখানে রয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ সুব্হা-নাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ﴾

অর্থ- "এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি। আর এরাই আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৯]

তাই তারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোনো গর্হিত আচরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। এককথায় "আখিরাতের উপর সুদৃঢ় ঈমানই" মানুষের জন্য এক কর্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُوْنَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوْقِنُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দমূল يقين-এর অর্থ হচ্ছে দৃঢ় প্রত্যয়। যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে– আখিরাতের প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখে কোনো বস্তু সম্পর্কেই কেবল হতে পারে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াকীন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান"।[২০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

ব্যাখ্যা: সূরা আল-বাক্বারাহ্'র প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উপরে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হিদায়াতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মু'মিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। নবী (ﷺ) পরিষ্কারভাবে যাদেরকে জান্নাতী বলে সাহাবীদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই সূরার তিন ও চার নম্বর আয়াতে তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। আর এখানে তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এসব লোকই হিদায়াত প্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'হিদায়াত'-এর তাফসীর করেছেন নূর ও দৃঢ়তা দ্বারা আর 'ফালাহ'-এর তাফসীর করেছেন প্রয়োজন মিটে যাওয়া ও পাপ এবং দুষ্কর্ম থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি। ইমাম ইবনু জরীর বলেন: এসব লোক প্রভূর পক্ষ হতে নূর, দলিল, দৃঢ়তা এবং সত্যতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর এরাই তাদের পবিত্র কার্যাবলীর কারণে পুণ্য ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের দাবীদার এবং এরাই শাস্তি হতে দূরে সরে থাকবে। এরা থাকবে যাবতীয় কল্যাণের মধ্যে। যেমন- আল্লাহ সুব্হা-নাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

অর্থ- "তাদের জন্যই রয়েছে সবধরণের কল্যাণ, আর তাঁরাই হবে সফলকাম।"[২১]

এই কল্যাণ ও সফলতা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই হতে পারে অথবা শুধু আখিরাতেও হতে পারে। আখিরাতের সফলতাই চূড়ান্ত ও প্রকৃত সফলতা। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ এবং আরো কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ আরবের মু'মিনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং তার পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহলে কিতাবের মু'মিনগণ। ইবনু জরীর বলেন: আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় اُولٰٓئِكَ-এর ইঙ্গিত আহলে কিতাবের দিকে, যার صفت (সিফাত) তার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসাবে وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ প্রথম আয়াত হতে পৃথক হবে এবং مبتدأ (মুবতাদা) হয়ে مرفوع (মারফু'উ) হবে এবং তার خبر (খবর) হবে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ কিন্তু এর ইঙ্গিত পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারীদের দিকে হওয়াই বেশি পছন্দনীয় মত। কেননা, এ আয়াতগুলো সাধারণ এবং এর ইঙ্গিতও হবে সাধারণ। মহান আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমাদের জীবনে এ তিনটি আয়াতের শিক্ষা

এ তিনিটি আয়াতে মুত্তাকীদের পাঁচটি প্রধান গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। যথা-

এক. ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।

দুই. সলাত তথা নামায ক্বায়েম করা।

তিন. মহান আল্লাহর পথে ব্যায় করা।

চার. সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস।

পাঁচ. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের সকলেরই উচিৎ মুত্তাকী হওয়ার লক্ষ্যে এই সকল গুণাবলি অর্জনে সদাস্বচেষ্ট হওয়া। আমরা যাদি মুত্তাকী হতে পারি তবেই তো কুরআনুল কারীমের নির্দেশিত সেই হিদায়াতের পথে অর্থাৎ- আলোর পথে চলতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উল্লেখিত গুণাবলি অর্জন করে মুত্তাকী হয়ে হিদায়াতের পথে (আলোর পথে) যাত্রা করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

[১৯] *সূরা আন্-নামল : ৫।*
[২০] *মুস্তাদরাকে হাকিম- ২/৪৪৬।*
[২১] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৮৮।*

درس الحديث / দারসুল হাদীসঃ

মৃত্যুর স্মরণ

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ". يَعْنِيْ الْمَوْتَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ- মৃত্যুর কথা স্মরণ করো।[২২]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতিঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণঃ একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণঃ তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এ সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানঃ সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যুঃ ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে বাকী কবর স্থানে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারবে না। তাই মু'মিন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমেই দুনিয়ার জীবনের সমাপনী আসে এবং আখিরাতের অনন্ত-অসীম জীবনের সূচনা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

"তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। যদি তোমরা মজবুত দূর্গের মধ্যে অবস্থান করো, তবুও।"[২৩]

তাই সর্বাবস্থায় আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা উচিত। কারণ কখন যে কার মৃত্যুর ডাক চলে আসে আমরা কেউই সেটা জানি না। আমাদের কাছে সেটা অজানা থাকলেও তাকদীরে সে ক্ষণ ও মুহূর্ত ঠিকই নির্দিষ্ট করা আছে। সবাই তাকদিরে লিখিত সুনির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾

"আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না। কেননা তা সুনির্ধারিত।"[২৪]

---

*প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[২২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০৭।*

[২৩] *সূরা আন্-নিসা : ৭৮।*

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

"বলো, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালোমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই।' প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"[২৫]

মৃত্যু নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ বেশিরভাগ মানুষ এ বিষয়ে উদাসীন। একজন মুসলিমের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে থাকতে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পরপারের পাথেয় সঞ্চয় করা। মানুষ মরণশীল। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে স্থায়ী নয় কেউ-ই। দুনিয়ার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে একদিন পাড়ি জমাতে হবে ওপারে। যেখানে বন্ধু হবে না কেউ, হবে না শত্রুও। নিজেকেই নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করা। রাসূল (ﷺ) বলেন,

وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ.

'আর তুমি নিজেকে কবরবাসী মনে করবে।'[২৬]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَاذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ.

'আর তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করবে। আর প্রত্যেক গাছপালা এবং পাথরের নিকট মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে।[২৭]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক আনসারী ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُوْلَئِكَ الْأَكْيَاسُ.

হে আল্লাহর রাসূল! কোন মু'মিন সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহাবী বললেন, কোন মু'মিন সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে বেশি মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য বেশি ভালো প্রস্তুতি নেয়। তারাই হলো জ্ঞানী লোক।[২৮]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، ثُمَّ بَدَا لِيْ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُوْرُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا.

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন আমার নিকট মনে হচ্ছে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কারণ তা অন্তরকে কোমল করে, চোখকে পানি ঝরাতে উৎসাহিত করে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলো না।[২৯]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) اذْكُرِ الْمَوْتَ فِيْ صَلَاتِكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيْ صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّيْ صَلَاةً غَيْرَهَا وإِيَّاكَ وكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি তোমার সালাতে মরণকে স্মরণ করো। কারণ মানুষ যখন তার সালাতে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার সালাত সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মতো সালাত পড়ো, যে মনে করে না যে, এছাড়া সে

[২৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৪৫।*
[২৫] *সূরা ইউনুস : ৪৯।*
[২৬] *সহীহুত তারগীব- হা. ৩৩৪১।*
[২৭] *সহীহুত তারগীব- হা. ৩১৫৯; সহীহাহ্- হা. ১৪৭৫।*
[২৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৫৯; সহীহাহ্- হা. ১৩৮৪; সহীহুত তারগীব- হা. ৩৩৩৫।*
[২৯] *আহমাদ- হা. ১৩৫১২; সহীহুল জামে'- হা. ৪৫৮৪।*

অন্য সালাত পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাকো, যা করে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়।[৩০]

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.

মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, আদম সন্তান দু'টি জিনিসকে অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মু'মিনের পক্ষে ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ মালের স্বল্পতায় (পরকালে) হিসাব-নিকাশ কম হয়।[৩১]

আবূদ্দারদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন,

مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ.

যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করবে তার হিংসা-বিদ্বেষ কমে যাবে এবং আনন্দ খুশী কমে যাবে।[৩২]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন,

اَسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِيْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ.

তোমরা মহান আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করো। সকলে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, না, ঐরূপ নয়। মহান আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিহবা, চোখ এবং কান) কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়) কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে'।[৩৩]

দাক্বাক্ব (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة، فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته.

যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করবে তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা সম্মানিত করা হবে। যথা- ১. দ্রুত তাওবাহ্ করার সুযোগ প্রদান, ২. অন্তরে পরিতৃপ্তি দান ও ৩. 'ইবাদতে উদ্যমতা। আর যে মৃত্যুকে ভুলে যাবে তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। যথা- ১. তাওবায় বিলম্বতা, ২. অল্পে অতুষ্টি ও ৩. 'ইবাদতে অনিহা। অতএব হে মৃত্যু ও মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে প্রতারিত ব্যক্তি! একটু চিন্তা করে দেখো।[৩৪]

মৃত্যুর স্মরণে মু'মিনের জন্য স্বস্তি আনে কেননা মানবজীবন নানারকম পরীক্ষায় ভরা। দারিদ্র্য, রোগ-শোক, প্রিয়জনের মৃত্যু, অপমান–এসবের মধ্য দিয়েই মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ﴾

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য- মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে 'আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[৩৫]

---

[৩০] *সহীহাহ্- হা. ১৪২১; সহীহুল জামে'- হা. ৮৪৯।*
[৩১] *আহমাদ- হা. ২৩৬৭৪; মিশকাত- ৫২৫১; সহীহাহ্- ৮১৩।*
[৩২] *মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ্- হা. ৩৪৫৮৩।*
[৩৩] *সুনানে তিরিমিযী- হা. ২৪৫৮; মিশকাত- হা. ১৬০৮।*
[৩৪] *আত-তাযকিরাহ- কুরতুবী, ১/১২৬।*
[৩৫] *সূরা আল-মুলক : ২।*

এই পরীক্ষা পার হয়ে মু'মিন যখন মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যায়, তখন তার জন্য মৃত্যু হয়ে ওঠে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির পথ।

মৃত্যু স্মরণ করলে মানুষ বাস্তবতায় ফিরে আসে। প্রিয়জন হারানোর মুহূর্তে যেমন দুনিয়ার ঝামেলা গৌণ হয়ে যায়, তেমনি মৃত্যুর কথা নিয়মিত মনে করলে আমরা বুঝি– আমাদের আসল জায়গা দুনিয়া নয়, আখিরাত।

দুনিয়ার কোনো ঝক্কি-ঝামেলায় পড়ে নিজের দ্রুত মৃত্যু কামনা না করা। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

তোমাদের কেউ যেন কোনো কঠিন বিপদে পড়ে নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয় তা হলে সে যেন এভাবে বলে– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতদিন পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকাটা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অন্যথা আমাকে মৃত্যু দিন যদি আমার মৃত্যু বরণ করাটা আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।[৩৬]

যে কোনো কারণে নিজের মৃত্যু কামনা করা এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, কারণ বেঁচে থাকলেই তো যে কেউ নিজের নেক 'আমল বাড়িয়ে নিতে পারবে অথবা নিজ কৃতকর্ম থেকে তাওবাহ্ করে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

আবূ উবাইদ্ সা'দ ইবনু উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيْئًا لَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.

তোমাদের কেউ যেন কখনো নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে নেককার হয়ে থাকে তা হলে সে নেক কাজে আরো অগ্রসর হবে। আর যদি সে বদ্‌কার হয়ে থাকে তা হলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজ কৃতকর্ম থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে।[৩৭]

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৫১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮০।*

উপসংহার

মৃত্যু এমন এক বাস্তবতা, যার ব্যাপারে কোনো মানুষেরই কোনো মতপার্থক্য নেই। মুসলিম-অমুসলিম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই স্বীকার করে যে, এই দুনিয়ায় চিরদিন থাকার জন্য আসিনি, একদিন আমার মৃত্যু হবে। কোনো কাফের, কোনো বেদ্বীন-মুনাফিকও তা অস্বীকার করতে পারে না। কিছু লোক তো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেছে, কিন্তু মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই জানে এবং বিশ্বাস করে যে, তার মৃত্যু হবে। তদ্রূপ এটাও বাস্তব যে, মৃত্যুর কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। এ বিষয়েও কোনো মানুষের কোনো মতানৈক্য নেই। আমি জানি না, কখন আমার মৃত্যু ঘটবে। এখনি একজন মানুষ বসে আছে, সে সুস্থ, কথাবার্তা বলছে অথচ এক ঘন্টার ভিতরেই সে দুনিয়া থেকে চলে গেল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল আর সে দুনিয়া থেকে চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন। কারো হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেল আর সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। লোকেরা বলে থাকে এটা তো বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, একজন মানুষ বসে আছে, কথাবার্তা বলছে অথচ মুহূর্তেই সে ঢলে পড়ল, হার্ট এ্যাটাক হয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে গেল!

আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়নি যা এ কথা বলে দিতে সক্ষম যে, এই মানুষটি কত সময় জীবিত থাকবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ কত উন্নতি সাধন করেছে। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এমন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি যা মানুষকে বলতে পারে যে, সে কতদিন দুনিয়ায় থাকবে এবং কখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।

ইসলাম মৃত্যুকে স্মরণ করে পরবর্তী জীবনের পরিণতি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া সেসব মানুষের নিন্দা করেছে, যারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। রাসূল (ﷺ) বেশি বেশি করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলেছেন।

[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৩৫।*

خطبة المسجد النبوى / মসজিদে নব্বীর খুত্বাহ্:

রমযানের পরেও নেক ‘আমলের উপর অবিচল থাকা

খতীব : শাইখ ড. আব্দুল মুহসিন আল-কাসেম (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদক : শাইখ ড. হারুনুর রশিদ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ)*

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা‘আলা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমনগণ! দিনগুলো ধারাবাহিকভাবে আসে ও চলে যায়, মাসগুলোও ক্রমান্বয়ে পেরিয়ে যায় ও শেষ হয়। রাত ও দিনের এই আবর্তনে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন। গতকালই যেন আমরা রমাযানের নতুন চাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আর আজ আমরা তার পাতা গুটিয়ে, তার দিন-রাতের প্রস্থানে তাকে বিদায় জানাচ্ছি, যেন তা ছিল কল্পনারই অংশ।

ইতিমধ্যেই সেই রাতগুলো ফযীলত ও প্রতিপালকের বিশেষ রহমতের ধারা নিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনারা এই মাসে যে সকল সৎকর্ম সম্পাদন করেছেন, তা সংরক্ষণ করুন ইখলাসের সাথে, ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকারপূর্বক এবং (মহান আল্লাহর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনারা ‘আমল করার চেয়ে ‘আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিন। কেননা মু’মিন ব্যক্তি উত্তম ‘আমল ও ভয়ের অনুভূতিকে একত্র করে। তার অবস্থা সেইরূপ, যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা যা দেয়ার তা দেয় ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, এজন্য যে তারা তাদের রব-এর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।”[১]

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি ঐসব লোক যারা মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? তিনি বললেন: না হে সিদ্দীক তনয়া! বরং এরা ঐ সমস্ত লোক যারা সাওম পালন করে, সালাত পড়ে ও দান সাদাক্বাহ্ করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত তাদের ‘আমল কবুল হবে না।

﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

“এরাই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে।”[২] আর সেই ‘ইবাদত কতই না সুন্দর, যখন তার পরে পালন করা হয় আরও ‘ইবাদত! আর কতই না মহিমান্বিত হয় সৎকর্ম, যখন তার সাথে যুক্ত হয় আরও সৎকর্ম! তাই আনুগত্যকে অব্যাহত রাখা এবং তার সময়কে দীর্ঘায়িত করাই হলো মু’মিনদের পাথেয়। বস্তুতঃ সৎকর্মের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বান্দা তো প্রতিটি মুহূর্তে রহমানের ‘ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট। আল্লাহ বলেন:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

অর্থ: “আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ‘ইবাদত করুন।”[৩]

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, “আরাম কখন?” তিনি বললেন: “জান্নাতে প্রথম পা রাখার সময়।”

আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা মহান আল্লাহর মু’মিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

---

* *মুহাদ্দিস, মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া মাদ্‌রাসা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।*
[১] *সূরা আল-মু’মিনূন: ৬০।*
[২] *সুনানে তিরমিযী।*
[৩] *সূরা আল-হিজর: ৯৯।*

অর্থ: "নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', অতঃপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা নাযিল হয় (এবং বলে) যে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, তার সুসংবাদ গ্রহণ করো।"[১] আর আল্লাহ তাঁর নবী (ﷺ) ও মু'মিনদেরকে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করে বলেছেন:

﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ﴾

অর্থ: "অতএব, আপনি যেমন আদিষ্ট হয়েছেন, তেমনি অবিচল থাকুন এবং আপনার সাথে যারা তাওবাহ্ করেছে তারাও।"[২] আর এ অবিচলতা হলো সকল কল্যাণের চাবিকাঠি এবং বরকত লাভের মাধ্যম; আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا﴾

"আর যদি তারা সরল পথে অবিচল থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর বারি বর্ষণে সিক্ত করতাম।"[৩]

কাজেই যে ব্যক্তি রমাযানে সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, সে যেন তা অব্যাহত রাখে। কেননা "মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় 'আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়"[৪]। আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, রমাযানের সৎকর্মসমূহ সারা বছর ধরে অব্যাহত রাখা যায়। যেমন- শাওয়ালের ছয় দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমান, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতি মাসের তিন দিন রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে, প্রত্যেক রাতেই তাহাজ্জুদ পড়ার বিধান রয়েছে, দান-সাদাক্বার দরজা উন্মুক্ত, আর দু'আ তো মানুষের জীবনের অপরিহার্য বিষয়।

ফযীলতপূর্ণ সময় ও স্থান কাউকে পবিত্র করে না- যতক্ষণ না সে নেক 'আমল করে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সঠিক পথে অবিচল থাকে। প্রকৃত সৌভাগ্যের মূল হলো দীর্ঘায়ু লাভ ও উত্তম 'আমল। আর যদি 'ইবাদতকে শুধু কোনো নির্দিষ্ট মাস বা বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বদা অব্যাহত রাখা হয়, তবে তা 'আমল কবুল হওয়া এবং উত্তমভাবে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার একটি বড় প্রমাণ।

সুতরাং আপনারা নিজেদেরকে পবিত্র করুন আনুগত্য সম্পাদন ও 'ইবাদতে একনিষ্ঠতার মাধ্যমে; মহান আল্লাহর অপার ক্ষমার আশায়। আর তাঁর সুবিশাল রহমত ও বিপুল দানে আপনারা আনন্দিত হোন।

﴿أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

অর্থ: "বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়। তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চেয়ে এটা উত্তম।"[৫]

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

"মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার ও আপনাদের ওপর বরকত নাযিল করুন।"

দ্বিতীয় খুত্‌বাহ্

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালো কাজের তাওফীক্ব দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তাঁর শানের প্রতি সম্মান রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা'আলা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে মুসলমানগণ! ঈদের দিনে মুসলিমদের আনন্দ পুনর্জীবিত হয় এবং তাদের ওপর মহান আল্লাহর নিয়ামত ও দানসমূহ প্রকাশ পায়, তাদের ফর্‌য সিয়ামের পূর্ণতা ও মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে। তাই আপনারা এ দিনে আনন্দ প্রকাশ করুন। কেননা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আনন্দিত হওয়া তাঁর প্রতি সন্তুষ্টিরই অংশ। আপনারা অন্যদের মাঝেও হাসি-আনন্দ প্রবেশ করান এবং নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের জন্য বৈধ সুযোগ-সুবিধার পরিধি বাড়িয়ে দিন।

আপনারা আল্লাহভীতি ও তাঁর তত্ত্বাবধানের সাথে আপনাদের ঈদের আনন্দকে যুক্ত করুন; তাহলে আপনারা কল্যাণ লাভ করবেন এবং ইহকাল ও পরকালে আপনাদের আনন্দ পূর্ণতা পাবে। মূলত যে দিনটিতে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় না, সেটাই প্রকৃত ঈদ; আর যে দিনটি মু'মিন ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আনুগত্য ও স্মরণে কাটায়, সেটাও তার জন্য ঈদ।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *[৩০ রমাযান-১৪৪৭ হিজরি, ২০ মার্চ-২০২৬ ঈসায়ী।]*

---

[১] *সূরা হা-মীম, আস-সাজদাহ্: ৩০।*
[২] *সূরা হূদ: ১১২।*
[৩] *সূরা আল-জিন্: ১৬।*
[৪] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৫] *সূরা ইউনুস: ৫৮।*

مقالةرئيسة / প্রধান রচনা:

ইসলামী শব্দাবলী : মানব আত্মার চাবিকাঠি

মীর লুৎফুল কবির সা'দী*

ডিজিটাল যোগাযোগের অত্যন্ত দ্রুতগতির এই যুগে মানুষ আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কথা বলে। স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে শব্দ মুহূর্তের মধ্যেই দেশ ও মহাদেশ অতিক্রম করে। কিন্তু এই অবিরাম যোগাযোগ প্রবাহের মাঝেও একটি নীরব বৈপরীত্য আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে– কথা যত বাড়ছে, অনেক সময় তার অর্থ যেন তত হালকা হয়ে যাচ্ছে। শব্দ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু তার ভেতরের গভীরতা প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে।

এই বাস্তবতা আমাদের ভাষার প্রকৃতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। শব্দ কেবল তথ্য বিনিময়ের যন্ত্র নয়; বরং এটি মানুষের চিন্তার কাঠামো নির্মাণ করে, বাস্তবতা উপলব্ধির দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তিও গড়ে তোলে।

ইতিহাসে দেখা যায়, সভ্যতা কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি বা প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না; বরং তা দাঁড়িয়ে থাকে একটি সমাজের যৌথ ভাষা ও শব্দভাণ্ডারের ওপর যেখানে লুকিয়ে থাকে সেই সমাজের নৈতিক কল্পনা, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং আধ্যাত্মিক চেতনা। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার ভাষাকে বলেছিলেন 'অস্তিত্বের আবাসস্থল।' তাঁর মতে, মানুষ ভাষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে বসবাস করে। শব্দ মানুষের চিন্তার স্থাপত্য নির্মাণ করে; যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীকে বোঝে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজ্জালি মানুষের হৃদয় ও জিহ্বার সম্পর্ক নিয়ে একই ধরনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মানুষের ভাষা তার হৃদয়ের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে। তবে এই সম্পর্ক একমুখী নয়; ভাষা যেমন হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করে, তেমনি তা হৃদয়কেও গঠন করে। মানুষ যে শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করে, সেগুলো ধীরে ধীরে তার চরিত্র ও চেতনার অংশ হয়ে যায়। সৎ ও আলোকিত শব্দ মানুষের ভেতরে বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য জন্ম দেয়; আর অসতর্ক ভাষা মানুষের ভেতরে অহংকার, উদাসীনতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করতে পারে। এই অর্থে জিহ্বা ও হৃদয়ের মধ্যে এক গভীর ও নীরব সংলাপ চলমান থাকে। যদি ভাষা মানুষের অন্তর্জগতকে গঠন করতে পারে, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে কোন শব্দগুলো মানুষের আত্মাকে আলোকিত করে?

ভাষা, জ্ঞান ও মানবিক সত্তা

মানুষকে যথার্থ অর্থেই ভাষাবান সত্তা বলা যায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মানুষকে 'সামাজিক প্রাণী' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমষ্টিগত জীবনের ক্ষমতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষকে আরেকভাবে বর্ণনা করা যায় মানুষ হলো অর্থ-অনুসন্ধানী সত্তা, যে ভাষার মাধ্যমেই পৃথিবীকে বোঝে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও এই উপলব্ধি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

"আল্লাহ প্রথম মানুষ আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।"[১]

মুসলিম পণ্ডিতরা এই আয়াতকে মানুষের জ্ঞানগত মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কিছুর নাম জানা মানে কেবল তার জন্য একটি শব্দ থাকা নয়; বরং তার প্রকৃতি বোঝা, তাকে চিনতে পারা এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে তার অবস্থান উপলব্ধি করা। এই অর্থে ভাষাই জ্ঞানের ভিত্তি। শব্দের মাধ্যমেই মানুষ জগৎকে ব্যাখ্যা করে এবং স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। আধুনিক দর্শনেও এই সত্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন লিখেছিলেন, "আমার ভাষার সীমাই আমার জগতের সীমা।" অর্থাৎ- মানুষ যে

---

* *লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও গবেষক।*
[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৩১।*

শব্দের ভেতরে বাস করে, তার জগতও সেই শব্দের ভেতরেই গড়ে ওঠে। এই কারণেই দৈনন্দিন ভাষার ভেতরে আধ্যাত্মিক চেতনার উপস্থিতি মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ইসলামী ভাষার আধ্যাত্মিক ব্যাকরণ

ইসলামী শব্দাবলি এমন এক ভাষিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে, যেখানে আধ্যাত্মিক স্মরণ কেবল মসজিদ বা ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনের অংশ হয়ে ওঠে। একজন মুসলিম কোনো কাজ শুরু করার সময় একটি বাক্য উচ্চারণ করেন, কোনো অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আরেকটি বলেন, সৌন্দর্যের সামনে বিস্ময় প্রকাশে আরেকটি এবং বিপদ বা দুঃখের সময় অন্য একটি বাক্য।

এভাবে এক ধরণের নীরব 'আধ্যাত্মিক ব্যাকরণ' গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী তার জীবনকে বোঝেন এবং ব্যাখ্যা করেন। এই শব্দগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিস্‌মিল্লা-হ: 'আল্লাহর নামে।' প্রথম দৃষ্টিতে এটি একটি ছোট বাক্য কিন্তু এর ভেতরে রয়েছে গভীর দার্শনিক তাৎপর্য। আধুনিক সংস্কৃতি প্রায়ই ব্যক্তিগত সাফল্য ও স্বনির্ভরতার ধারণাকে অতিরঞ্জিত করে। বিস্‌মিল্লা-হ সেই ধারণাকে বিনয়ের সঙ্গে সংশোধন করে। এটি মানুষের চেষ্টা ও দায়িত্বকে স্বীকার করে কিন্তু একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় চূড়ান্ত ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়। বিস্‌মিল্লা-হ উচ্চারণ করা মানে হলো মানুষের কর্মকে মহান আল্লাহর স্মরণের সঙ্গে যুক্ত করা। এর মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করে সে চেষ্টা করবে কিন্তু ফলাফল শেষ পর্যন্ত একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল।

কৃতজ্ঞতার দর্শন

ইসলামী শব্দভাণ্ডারের আরেকটি মৌলিক শব্দ হলো আলহামদুলিল্লাহ: 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কৃতজ্ঞতাকে মানসিক সুস্থতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা জীবনের প্রতি বেশি ইতিবাচক মনোভাব ধারণ করেন এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থিতিশীল থাকতে পারেন। কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্যে কৃতজ্ঞতার এই চর্চা বহু শতাব্দী আগেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। একজন মানুষ যখন আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তখন তিনি শুধু কোনো নির্দিষ্ট অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান না; বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মহান আল্লাহর দান হিসেবে দেখতে শেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনদর্শনকে বদলে দেয়। সাফল্য তখন আর অহংকারের কারণ হয় না; বরং কৃতজ্ঞতার উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে। আবার দুঃখও কেবল হতাশার কারণ হয় না; বরং তা ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধির সুযোগে পরিণত হয়।

বিস্ময়ের পুনর্জাগরণ

শিশুরা ফুলে ফলে সুশোভিত এই পৃথিবীকে বিস্ময়ের চোখে দেখে। একটি ফুল, একটি পাখি কিংবা রাতের আকাশের নক্ষত্র তাদের সহজেই মুগ্ধ করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক সময় সেই বিস্ময়বোধ হারিয়ে ফেলে। সুবহানাল্লাহ: 'আল্লাহ পবিত্র' এই শব্দটি সেই হারিয়ে যাওয়া বিস্ময়কে পুনরুজ্জীবিত করে। যখন মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য বা সৃষ্টির জটিলতার সামনে এই শব্দ উচ্চারণ করে তখন তার পর্যবেক্ষণ ধীরে ধীরে ধ্যান-চিন্তায় রূপ নেয়। তখন প্রকৃতি আর নিছক বস্তুগত বাস্তবতা নয়; বরং তা হয়ে ওঠে স্রষ্টার নিদর্শনে পরিপূর্ণ এক অর্থবহ জগৎ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১]

শোক ও প্রত্যাবর্তনের ভাষা

মানুষের জীবনে শোক অবশ্যম্ভাবী। প্রিয়জনের মৃত্যু, স্বপ্নের ভাঙন কিংবা জীবনের অনিশ্চয়তা মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এমন মুহূর্তে ভাষা অনেক সময় যথেষ্ট মনে হয় না।

কুরআন এই পরিস্থিতিতে একটি গভীর বাক্য শিক্ষা দেয়:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন', অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[২]

এই বাক্য স্বাভাবিক দুঃখবোধকে অস্বীকার করে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও তাঁর প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে অশ্রু

[১] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৯০।*
[২] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৫৬।*

বিসর্জন করেছিলেন। এই বাক্য মানুষকে মনে করিয়ে দেয় জীবনের শুরু যেমন মহান আল্লাহর কাছ থেকে, তেমনি শেষ প্রত্যাবর্তনও তাঁর কাছেই। এই উপলব্ধি শোককে হতাশাগ্রস্থ নয়; বরং অর্থপূর্ণ করে তোলে।

অনিশ্চয়তার বিনয়

মানুষ প্রায়ই মনে করে যে সে তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে মানুষের পরিকল্পনার বাইরে অনেক কিছু ঘটে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে ইসলামী ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রয়েছে ইন্‌শা-আল্লাহ: 'আল্লাহ চাইলে।' এই বাক্য মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে মোটেও নিরুৎসাহিত করে না; বরং তাকে বিনয়ী করে তোলে। মানুষ পরিকল্পনা করবে, চেষ্টা করবে কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল মহান স্রষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল এই উপলব্ধিই ইন্‌শা-আল্লাহর অন্তর্নিহিত শিক্ষা।

মানবিক সম্পর্কের ভাষা

ইসলামী শব্দাবলি মানুষের সামাজিক সম্পর্কেও গভীর প্রভাব ফেলে। আসসালামু আলাইকুম: 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' এই সম্ভাষণ কেবল সৌজন্যের বাক্য নয়; বরং এটি অন্যের প্রতি নিরাপত্তা ও শুভকামনার ঘোষণা। একইভাবে জাযাকাল্লাহু খাইরান: 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন' এই বাক্য কৃতজ্ঞতাকে মহান স্রষ্টা মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারের ওপর ন্যস্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভাষার নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"[১]

শব্দের আলো

ইসলামী শব্দাবলি কেবল ধর্মীয় বাক্য নয় এগুলো মানুষের নৈতিক দিকনির্দেশনা, মানসিক স্থিতি এবং আধ্যাত্মিক স্মরণবোধের উৎস। এগুলো মানুষের ভেতরে কৃতজ্ঞতা, বিনয়, ধৈর্য, আস্থা ও আশা জাগিয়ে তোলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার তাঁর সাহাবিদের বলেছিলেন, "দু'টি বাক্য আছে যা জিহ্বায় হালকা কিন্তু 'আমলের পাল্লায় ভারী এবং পরম করুণাময়ের নিকট প্রিয়, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম।"[২] এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাধারণ শব্দও 'ইবাদতে পরিণত হতে পারে।

এসব শব্দাবলি যখন শুধু অভ্যাস নয় সচেতন উপলব্ধির সঙ্গে আন্তরিকভাবে হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় তখন সেগুলো মানুষের জীবনে আলো ছড়ায়, পরম প্রশান্তি নিয়ে আসে মনে। তখন মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করে এক প্রকৃত চরম সত্য, সে একা নয়। তার একজন স্রষ্টা আছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সার্বক্ষণিক সেই স্রষ্টার স্মরণেই নিহিত রয়েছে হৃদয়ের প্রশান্তি এবং জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সাফল্য।

মৃত্যু সংবাদ ও দু'আর আহ্বান

কিশোরগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি ও জামি'আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া, গাজীপুর-এর ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আব্দুল মালিক বিন সিরাজ উদ্দিন মাদানীর একমাত্র সন্তান মুহাম্মদ আনাস (১৯) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। এছাড়াও দুর্ঘটনায় শাইখ আব্দুল মালিক মাদানী ও তাঁর স্ত্রী আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

انا لله وانا إليه راجعون.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুমা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

[১] *সহীহুল বুখারী।*

[২] *সহীহ মুসলিম।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধঃ

পবিত্র হজ্জ ভ্রমনে সুবিধা, অসুবিধা ও করণীয়

ডা. সুলতান আহমদ*

ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে হজ্জ হচ্ছে অন্যতম রোকন। যাঁদের অর্থ আছে এবং শারীরিক সামর্থ আছে, তাঁদের উপর হজ্জ ফর্‌য করা হয়েছে। কিন্তু যদি অর্থ ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে তাহলে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সে ইয়াহুদী হয়ে মরুক কি খ্রিষ্টান হয়ে, কিছুই যায় আসে না।[১] হজ্জের অর্থ শতভাগ হালাল হতে হবে। হারাম অর্থ দিয়ে হজ্জ মহান আল্লাহর কাছে কবুলও হবে না, গুণাহ মাফও হবে না। অন্যের হক্ব নষ্ট করে, অন্যকে আঘাত দিয়ে, পিতা-মাতার খেদমত না করে হজ্জ করা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

অর্থঃ "মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হলো, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে সে যেন হজ্জ সম্পাদন করে। যে ব্যক্তি এই নির্দেশ অমান্য করে কুফ্‌রীর আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ বিশ্ব জগতে কারো মুখাপেক্ষী নন।"[২]

﴿وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও 'উমরাহ্ পূর্ণ করো।"[৩]

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

অর্থঃ "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো আর তাক্বওয়াই হলো শ্রেষ্ঠ পাথেয়ও। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।"[৪]

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ﴾

অর্থঃ "অতঃপর যে ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোতে হজ্জ সম্পাদনের স্থির সিদ্ধান্ত নিবে, তার জন্য স্ত্রী সম্ভোগ, অশ্লীলতা, যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ-আচরণ এবং কলোহ বিবাদ সঙ্গত নয়।"[৫]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সলাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় সবরকারীদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।"[৬]

«اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ».

অর্থঃ সফর হচ্ছে আগুনের অংশ।[৭]

তালবিয়াঃ

"لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ".

অর্থঃ আমি হাজির হয়েছি আল্লাহ, তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারি এবং রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বও তোমার। তোমার কোনো শরীক নেই।[৮]

এবার পবিত্র হজ্জ ভ্রমনে সুবিধা-অসুবিধা ও করণীয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক।

হজ্জ মানেই কষ্টদায়ক, কষ্ট আর কষ্ট!

সুবিধার চেয়ে অসুবিধায় বেশি। তাই ধৈর্য্যই সফলতার মূল মন্ত্রক এবং কায়মনোবাক্যে ইয়াক্বীনের সাথে সর্বদায়

---

* *স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।*

[১] *জামে' আত্ তিরমিযী; মুসনাদে আহমাদ।*
[২] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ৯৭।*
[৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*
[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*
[৬] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৫৩।*
[৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৮২, সহীহ।*
[৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৯১৯।*

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য ও রহমত কামনা করা সম্মানীত হাজীদের জন্য কল্যাণকর।

অসুবিধাঃ ১. বেশি বয়স হওয়া। **২.** নানান রোগে আক্রান্ত থাকা। **৩.** শারীরিক ও মানুসিকভাবে অসুস্থ্য থাকা। **৪.** মনমানসিকতা হজ্জ মুখী না থাকা। **৫.** হজ্জ সংক্রান্ত জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকা। **৬.** কৃপণতা স্বভাব। **৭.** দুনিয়াবী ত্যাগ না করা। **৮.** হজ্জে গিয়ে কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। **৯.** হজ্জের নিয়ম-নীতি তথা পরিচালন সংস্থার নির্দেশনা অমান্য করা। **১০.** হাতের বেল্ট, ব্যাচ, আবাসন ঠিকানা, মোবাইল নম্বর কাছে না রাখা। **১১.** একা একা ইচ্ছামত চলাফেরা করা। **১২.** গুরুপাক খাওয়া, অতিভোজন করা, নিজেকে বেশি চতুর ভাবা। **১৩.** গাইডকে অনুসরণ না করা। **১৪.** স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব। **১৫.** নূণ্যতম প্রয়োজন মিটানোর জন্য সর্বদায় প্রস্তুত না থাকা। **১৬.** সমালোচনায় ব্যস্ত থাকা। **১৭.** অতিব্যয় করার প্রবণতা। **১৮.** ত্যাগের মনোভাব না থাকা। **১৯.** ভোগের দিকে ব্যস্ত থাকা। **২০.** শুধু অন্যের ভুলধরার প্রবণতা। **২১.** অধৈর্য্য হওয়া। **২২.** হারিয়ে যাওয়া।

সুবিধাঃ ১. হজ্জ কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা বা জ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য। হজ্জের জ্ঞান থাকলে সামান্য অসুবিধাও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। **২.** অভিজ্ঞদের কাছ থেকে হজ্জ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা ও গুরুত্বের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। **৩.** পরিচালন সংস্থা বা দক্ষ ও অভিজ্ঞ গাইডদের সহায়তা পাওয়া। **৪.** ধৈর্য্যের কোনো বিকল্প নেই। **৫.** কবজ্জি বেল্ট, ব্যাচ, আবাসন ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর কাছে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। **৬.** ত্যাগী হও, ভোগী হয়ো না। **৭.** মহান আল্লাহর রহমতের আশায় নিমগ্ন থাকলে সমস্যা হবে না। **৮.** যে রোগের ঔষুধ সেবন করতেন তা কাছে রাখা। **৯.** ডায়াবেটিকস ও রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ রাখা। **১০.** দুঃশ্চিন্তা পরিহার করা। **১১.** ভাঙ্গতি টাকা/রিয়াল কাছে রাখা। **১২.** পরিচালন সংস্থা ও গাইডদের নির্দেশনা অনুসরণ করা। **১৩.** নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো। **১৪.** রাগকে সংবরণ করা। **১৫.** সরকারী ব্যবস্থাপনায় বা বিশ্বস্ত কল্যাণকামী হজ্জ কাফেলার মাধ্যমে হজ্জ পালন করলে সার্বিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভবনা বেশি। **১৬.** মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।[১] **১৭.** কবুলিয়াত হজ্জের বিনিময়ে নিস্পাপ শিশুর মতো হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।[২] **১৮.** অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত গাইড পেলে সফরসহ সকল কাজ সহজ হবে এবং হজ্জও সঠিক হবে ইন্ শা-আল্লাহ। **১৯.** তার আগে সহীহ নিয়ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

করণীয়ঃ ১. নিজের ও পরিবারের পাথেয় থাকা বা ব্যবস্থা করে যাওয়া। **২.** প্রলোভন বর্জন করা। **৩.** হজ্জের নিয়ত করার পর থেকে হজ্জ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা। **৪.** অভিজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করা। **৫.** হজ্জের কষ্ট মেনেই মাইন্ডসেটাপ করে নেয়া। **৬.** হজ্জ মন্ত্রণালয়ের ও হজ্জ অফিসের সকল নির্দেশনা অনুসরণ করা। **৭.** পরিবহনযোগ্য বডিব্যাগ থাকা। যাতে অতিব জরুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখা যায়। **৮.** শুকনা খাবার বা ফলফলাদি কাছে রাখা। **৯.** পাসপোর্টসহ সকল প্রমাণ কাছে রাখা। **১০.** রিয়াল বা টাকা একাধিক গোপন জায়গায় রাখা। **১১.** তওয়াফের সময় এবং অতিরিক্ত ভিড়ে পকেট মারা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। **১২.** কোনো প্রকার শির্ক ও বিদআতে লিপ্ত না হওয়া। **১৩.** বেশি আরাম আয়েশে ও অবহেলায় গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র সময়কে নষ্ট না করা। **১৪.** ফজর থেকে যোহর, 'আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অনেক সময়, তখন ঘুমিয়ে থাকা যায়। **১৫.** অন্য সময়েও হজ্জের কাজে নিবেদিত থাকা। **১৬.** বায়তুল্লাহতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের চেষ্টা করা। **১৭.** জিয়ারার সময় সচেতন থাকা। **১৮.** গীবত পরিহার করা। **১৯.** তালবিয়াসহ হজ্জের প্রয়োজনীয় দু'আসমূহ পাঠ করা। **২০.** পেটের সমস্যা থাকলে গুরুপাক খাদ্য বর্জন করা। **২১.** কোনো কারণে হারিয়ে গেলে দেশীয় পতাকা চিহ্নিত কর্মী বা সেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে নিকটস্থ হজ্জ অফিসে যাওয়া।

মন্দা কথা হলো– হজ্জে গমেনিচ্ছুক ব্যক্তি যদি খুলুসিয়াত মনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দুনিয়াবীমোহ ত্যাগ করে হজ্জের জন্যই যা যা করণীয় তাই করা কর্তব্য এবং যা যা বর্জনীয় তা বর্জন করা ঈমানের দাবী। হজ্জের অর্থও অবশ্যই হালাল হতে হবে। হককুল্লাহ এবং হককুল ইবাদের ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। নিজের স্বার্থকে কবর দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলে সর্বদা মক্ত থেকে নিস্পাপ শিশুর মতো হওয়ার আকাঙ্খা থাকা। তাই তো রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে কেউ এমনভাবে হজ্জ করবে যে, তাতে রাফাস, ফুসুক ও জিদাল তথা অশ্লীলতা, পাপ ও ঝগড়া ছিল না, সে তার হজ্জ থেকে সে দিনের ন্যয় ফিরে আসল, যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।[৩]

---

[১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৮৮।*

[২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৮৯।*

[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫০।*

এক নজরে ‘উমরাহ্ এবং হজ্জ

জান্নাতুল মহল*

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। মহান আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যিনি সর্বশেষ নবী এবং এসেছেন সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ। আর তাঁর বংশধর, সাহাবী ও প্রতিদান দিবস (কিয়ামাত) পর্যন্ত যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের সবার উপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না।”[১]

‘উমরাহ্ ও হজ্জ

ক. ইহরাম বাধা: ইহরাম বাঁধার জন্য ৫টি কাজ। যথা- **১.** শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, **২.** গোসল, **৩.** ইহরামের কাপড় পরিধান, **৪.** নিয়ত (উমরার সময় মীকাতে। হজ্জের সময় মক্কায়, মীনাতে যাওয়ার সময় গাড়ীতে বসে), **৫.** তালবিয়া পাঠ।

খ. তাওয়াফ করা: ১. শুরু: হাজরে আসওয়াদ চুমু দিয়ে বিস্‌মিল্লা-হ আল্লাহু আকবার বলে। **শেষ:** হাজরে আসওয়াদে এসে। **২.** সাত (৭) বার। **৩.** তৃতীয় কোণ থেকে দু‘আ– রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা ‘আযাবান নার। **৪.** তাওয়াফ শেষে– দু’টি কাজ। দুই রাকআত সালাত, যম্‌যমের পানি পান করা ও মাথায় (প্রবাহিত করা) দেওয়া।

গ. সায়ী করা: ১. শুরুতে দু‘আ একবার, **২.** দুই পাহাড়ে উঠতে উঠতে দু‘আ, **৩.** দুই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দু‘আ। **৪.** মাঝখানে সবুজ জায়গায় দু‘আ। **৫.** শুরু হবে সাফা পাহাড়ে ও শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে, এভাবে ৭ (সাত) বার। **৬.** ইহরাম থেকে মুক্ত।

হজ্জের ৫ দিন: ৮-১২ যিলহাজ্জ।

ইহরাম বাধাঁ ফর্‌য: ইহরাম বাধাঁর জন্য ৫টি কাজ– মক্কায়। **১.** শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। **২.** গোসল। **৩.** ইহরামের কাপড় পরিধান করা। **৪.** নিয়ত– মীনাতে যাওয়ার সময় গাড়ীতে বসে। **৫.** তালবিয়া– মীনাতে যাওয়ার সময় গাড়ীতে বসে।

৮ তারিখ মক্কা থেকে মীনা: (করণীয় ও বর্জনীয়)

বর্জনীয়: ১. ঝগড়া, ফ্যাসাদ অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। **২.** প্রতি পাঁচ ওয়াক্তিয়া সালাতে– সুন্নত সালাত পড়া লাগবে না।[২]

করণীয়: ১. ৫ ওয়াক্ত সালাত কসর। **২.** মীনাতে ফজরের সুন্নত, বিতর, তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে। **৩.** তাসবীহ, তাকবীর, তালবিয়া ও বেশি বেশি দু‘আ করবেন। **৪.** বেশি বেশি অন্যের উপকার করবেন।

৯ তারিখ মীনা থেকে আরাফাত (আরাফাতে অবস্থান ফর্‌য)

আরাফাতে কি কাজ?

১. আরাফাত অবস্থান যোহরের সময় থেকে– ফর্‌য। **২.** সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান– ওয়াজিব।

৩. যোহর ও আসর– যহরের আউয়াল ওয়াক্তে কসর ও জমা। এক আযান– দুই ইকামতে।

৪. এই দুই সালাতের পূর্বে মাঝে ও পরে অন্য কোনো সালাত নেই। এমনকি সালাতের সাথে সুন্নত সালাতও নেই।[৩]

৫. প্রতিটি মুহূর্ত দু‘আ করবেন এবং সর্বোত্তম দু‘আ– “লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর।”

৬. খোলা আকাশের নিচে একাকী কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দু‘আ/প্রার্থনা।

৭. তাকবীর, তাহলীল ও তালবিয়া পড়তে হবে বার বার।

৮. বেশি বেশি ইস্তিগফার করবেন।

৯. হাজীদের জন্য সিয়াম নেই।

১০. প্রতিটি মুহূর্ত খুবই গুরত্বপূর্ণ। অনুধাবন করুন হজ্জকে। হজ্জকে মূল্যায়ন করুন। বাহিরে যেখানে সেখানে ঘোরা-ফেরা করা বা অনর্থক কথা বা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকুন।

১১. বার বার হাত তুলে দু‘আ।

১২. তাকবীর– তাহলীল: উচ্চারণ– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ। **অর্থ:** আল্লাহ

---

* *হজ্জ ট্রেইনার, বাংলাদেশ হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

[২] *সহীহ মুসলিম।*

[৩] *সহীহ মুসলিম।*

সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

- ৯ তারিখ ফজর সালাতের পর থেকে ১৩ তারিখ আসরের সালাতের পর পর্যন্ত, প্রত্যেক সালাতের পর তাকবীর, তাহলীল– নির্ধারিত।
- যিলহাজ্জ চাঁদ উঠার পর থেকে ১৩ তারিখ সূর্য ডুবার আগ/পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকবীর, তাহলীল– অনির্ধারিত।

৯ যিলহাজ্জ দিনগত রাত্রি মুযদালিফা (ওয়াজিব)

মুযদালিফায় কি কাজ?

১. মাগরিব + 'ইশা ... কসর ও জমা। ইকামত দুই বার- মাগরিব- তিন রাকাত + 'ইশার– দুই রাকাত। এর মাঝে পরে কোনো সুন্নত, নফল এবং বিত্র নেই।[১]

২. ঘুমাতে হবে– অল্প কিছু সময় হলেও।

৩. ফজর সালাত শেষ হলে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ, তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল, তালবিয়া পড়তে হবে।

৪. সূর্য উঠায় আগেই চলে যেতে হবে– আকাশ একটু ফর্সা হলে।

৫. সকাল হলে পাথর কুরাবে।

১০ তারিখ হজ্জের সবচেয়ে বড় দিন (৪টি কাজ)

১. ১০ তারিখ পাথর মারা– শুধু বড় জামারুতুল আকাবা একটি একটি করে সাতটি পাথর মারতে হবে। পাথর মারার পর তালবিয়া বন্ধ (প্রতিটি পাথর ছুঁড়ব, 'আল্লাহু আকবার' বলে)।

২. হাদী যবেহ– কুরবানী (ওয়াজিব)। (সবচেয়ে উত্তম ব্যাংকের মাধ্যমে)

৩. চুল কাটা। (ওয়াজিব)

৪. তাওয়াফ ও সায়ী– (ফর্য)।

- ১০ এবং ১১ যিলহাজ্জ দিনগত রাত্রি মিনায় থাকা (ওয়াজিব)।
- ৮ তারিখ মিনায় থাকা সুন্নত।
- ১১ এবং ১২ যিলহাজ্জ।

৩টি জামারাতে পাথর মারা:

প্রথমে– ছোট জামারাতে পাথর মেরে একটু সরে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ।

মধ্যম– জামারাতে পাথর মেরে একটু সরে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ।

বড়– জামারাতে পাথর মেরে যেতে যেতে দু'আ। (প্রত্যেক জামারাতে একটি একটি করে ৭টি পাথর/কঙ্কর ছুড়তে হবে এবং প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলবে)।

এরপর মীনা থেকে মক্কায়।

সবশেষে– বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)।

তালবিয়া: উচ্চারণ– লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা-শারীকা লাক। **অর্থ:** আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরিক নেই।

এক নজরে 'উমরাহ্ এবং হজ্জ

'উমরাহ্: ➲ *ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন কোথায়?*

জবাব: ঘরে, হজ্জ ক্যাম্পে অথবা বিমানের মধ্যে মিকাত আসার পূর্বে

➲ *নিয়ত কোথায় করবেন?*

জবাব: মিকাতে। বাংলাদেশ থেকে যারা সরাসরি মক্কায় যাবেন তারা বিমানের মধ্যে মিকাতের কাছাকাছি আসলে আর যারা সরাসরি মদীনায় যাবেন তারা মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যুলহুলাইফা মিকাতে।

নিয়ত: আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা 'উমরাহ্তান নিয়তের পর তালবিয়া শুরু।

তালবিয়া বন্ধ বা শেষ: তাওয়াফের পূর্বে।

ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ এবং সায়ী তারপর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর ইহরামমুক্ত।

হজ্জ: ➲ *ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন কোথায়?*

জবাব: আপনি মক্কায় যে বাসায় বা হোটেলে অবস্থান করছেন সেখানে।

➲ *নিয়ত কোথায় করবেন?*

জবাব: মক্কায় যে বাসায় বা হোটেলে অবস্থান করছেন সেখানে। অথবা মীনাতে যাওয়ার পূর্বে মক্কায় গাড়ীতে বসে।

নিয়ত: আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জা নিয়তের পর তালবিয়া শুরু।

তালবিয়া বন্ধ বা শেষ: ১০ যিলহাজ্জ পাথর মারার পর।

১০ যিলহাজ্জ পাথর মারা, (কুরবানী) হাদী যবেহ, মাথামুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর ইহরামমুক্ত হয়ে সাধারণ কাপড়ে তাওয়াফ ও সায়ী।

[১] *সহীহুল বুখারী।*

কুরআনের মর্যাদা ও মানবজীবনে তার প্রভাব

মো. মনিরুজ্জামান*

[চতুর্থ (শেষ) পর্ব]

১৪. কুরআন সমাজে দারিদ্র্য ও স্বার্থপরতা দূর করে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও।"[৬৬]

তাফসীর ইবনু কাসীর: যাকাত দান ও কুরআনের সামাজিক আদেশ দরিদ্রদের সুরক্ষা ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।[৬৭]

তাফসীরে জাকারিয়া: সমাজে দারিদ্র্য ও অনাস্থা দূর করতে কুরআন কার্যকর।[৬৮]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "যাকাত সমাজের সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করে।"[৬৯]

কুরআন মানব সমাজে ন্যায্যতা, সাহায্য ও সৌজন্যের সংস্কৃতি তৈরি করে।

১৫. কুরআন আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি শেখায়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রতিটি আত্মা দেখুক, সে আগামী দিনের জন্য কী প্রেরণ করেছে।"[৭০]

তাফসীর ইবনু কাসীর: কুরআন মু'মিনকে আত্মপর্যালোচনা ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে শেখায়।[৭১]

তাফসীরে জাকারিয়া: আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি কুরআনের মূল শিক্ষা। এটি আত্মসংযম ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে।[৭২]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আখিরাতের জন্য নিজের কাজের হিসাব নেবে।[৭৩]

কুরআন মু'মিনকে পার্থিব জীবনের চেয়ে আখিরাতকে প্রধান্য দিতে শেখায়। এটি জীবন-উপলব্ধি ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে।

১৬. কুরআন ও বিজ্ঞান/প্রকৃতি নির্দেশনা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ﴾

"তারা কি আকাশের পাখিগুলো দেখছে না, যারা সোজা উড়ছে, তাদের ধরে রাখতে পারে শুধুমাত্র দয়ালু আল্লাহ?"

তাফসীর ইবনু কাসীর: কুরআন প্রকৃতির নিখুঁত নিয়ম, সৃষ্টির বিশ্লেষণ ও সৃষ্টির প্রজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি দেয়।[৭৪]

তাফসীরে জাকারিয়া: প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের নিয়ম মানবকে চিন্তা ও প্রজ্ঞা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে।[৭৫]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি চোখ খোলে, সে আল্লাহর সৃষ্টির শক্তি ও প্রজ্ঞা দেখতে পায়।"[৭৬]

কুরআন মানুষকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উৎসাহ দেয়, যা বিজ্ঞান ও যুক্তি চর্চার প্রাথমিক ভিত্তি।

১৭. কুরআন মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় শিক্ষা দেয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়, উৎকৃষ্ট আচরণ ও আত্মীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের।"[৭৭]

তাফসীর ইবনু কাসীর: মানুষের মধ্যে ন্যায়, সমতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করাই কুরআনের লক্ষ্য।[৭৮]

তাফসীরে জাকারিয়া: কুরআন সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা সকল যুগে প্রাসঙ্গিক।[৭৯]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণতা মহান আল্লাহর নূরে উজ্জ্বল।"[৮০]

---

* *সাবেক প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, যশোর জেলা।*

[৬৬] *সূরা আল-বাক্বারাহ : ৪৩।*
[৬৭] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলিউম : ১, পৃ. ৩০৮।*
[৬৮] *তাফসীর আবু বক্‌র জাকারিয়া- সূরা আল-বাক্বারাহ, পৃ. ১৩০।*
[৬৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬০৬।*
[৭০] *সূরা আল-হাশ্‌র : ১৮।*
[৭১] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৫, পৃ. ৬১২।*
[৭২] *তাফসীর আবু বক্‌র জাকারিয়া- সূরা আল-হাশ্‌র, পৃ. ২২৮।*
[৭৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭১৭।*
[৭৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৫, পৃ. ৩২৮।*
[৭৫] *তাফসীর আবু বক্‌র জাকারিয়া- সূরা আল-মুলক, পৃ. ৮৭।*
[৭৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৮৬।*
[৭৭] *সূরা আন্‌-নাহ্‌ল : ৯০।*
[৭৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৪, পৃ. ৬০৭।*
[৭৯] *তাফসীর আবু বক্‌র জাকারিয়া- সূরা আন্‌-নাহ্‌ল, পৃ. ৯২।*
[৮০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৭।*

কুরআন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে কেউ বঞ্চিত হয় না, সবাই সমান অধিকার পায়।

১৮. কুরআন ক্ষমাশীলতা ও দ্বন্দ্ব সমাধান শেখায়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হও; নিশ্চয় আল্লাহ সৎ ও দয়ালুদের ভালোবাসেন।"[৮১]

তাফসীর ইবনু কাসীর: কুরআন প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমাশীলতা ও সমাধানকে প্রাধান্য দেয়।[৮২]

তাফসীরে জাকারিয়া: যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বে ক্ষমাশীল হয়, সে মহান আল্লাহর দয়া ও আশীর্বাদ অর্জন করে।[৮৩] নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ক্ষমা করা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।"[৮৪] কুরআন মানুষকে প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমাশীলতা ও সমাধান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

১৯. কুরআন অর্থনীতি ও ব্যাবসায়িক নীতি শেখায়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করো না, যদি না তা ব্যবসা ও পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে হয়।"[৮৫]

তাফসীর ইবনু কাসীর: কুরআন ব্যবসা ও লেনদেনের ন্যায্যতা ও সততার শিক্ষা দেয়।[৮৬]

তাফসীরে জাকারিয়া: সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ব্যবসা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করে।[৮৭]

নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যাক্তি সততার সাথে ব্যবসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার ব্যবসায় বরকত দেন।"[৮৮]

কুরআন অর্থনৈতিক নীতি স্থাপন করে– সততা, ন্যায় ও দায়িত্বশীলতা বজায় রেখে সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

২০. কুরআন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নীতি, যুগোপযোগী শিক্ষার উৎস: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম দৃষ্টান্ত আছে।"[৮৯]

তাফসীর ইবনু কাসীর: কুরআন ও নবী (ﷺ)-এর জীবন থেকে মানবজাতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নীতি শিখতে পারে।[৯০]

তাফসীরে জাকারিয়া: কুরআন মানুষের জন্য সার্বজনীন, যুগোপযোগী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করে।[৯১]

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, "আমার আচরণ কুরআনের প্রতিফলন।"[৯২]

কুরআনের শিক্ষা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী নীতি ও দিশা প্রদান করে।

কুরআনের শিক্ষা ও মানবজীবনে প্রভাব: সম্পর্কে কুরআন এবং সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনার সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি–

১. জীবনের দিশা ও মূলনীতি: কুরআন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়; এটি মানুষের জীবনের সর্বমুখী দিশা।

প্রতিটি আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য, দায়িত্বশীল ও মানবিক হতে হয়।

তাই সবাইকে অনুরোধ করা যায়– প্রতিদিন কুরআনের তাদাব্বুর (গভীর-চিন্তন) করুন এবং নিজেকে মূল্যায়ন করুন যে, আপনার দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত ও আচরণ কুরআনের নীতি অনুযায়ী হচ্ছে কি না।

২. হৃদয় প্রশান্তি ও মানসিক শক্তি: কুরআন মানুষের হৃদয়কে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করলে, আমরা জীবনের চাপ, উদ্বেগ ও হতাশা মোকাবেলায় শক্তি পাই।

উদাহরণস্বরূপ, সূরা আর্-রা'দ: ২৮-এর তাদাব্বুর করলে বোঝা যায় কুরআনের আলোয় হৃদয় প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব।

পরামর্শ: কঠিন পরিস্থিতিতে কুরআন পাঠ ও দু'আ আপনার মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়ক।

৩. নৈতিক চরিত্রের বিকাশ: কুরআন সততা, ধৈর্য, দয়া, ক্ষমাশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা শেখায়।

এই নীতি ব্যক্তি ও সমাজকে দৃঢ়, বিশ্বাসযোগ্য ও মানবিক করে তোলে।

উৎসাহ: প্রতিদিন অন্তত একটি আচার বা সিদ্ধান্ত কুরআনের নৈতিক নির্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে মূল্যায়ন করুন।

---

[৮১] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ১৩।*
[৮২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৩, পৃ. ৪২৫।*
[৮৩] *তাফসীর আবু বক্র জাকারিয়া- সূরা আল-মায়িদাহ্, পৃ. ১৪২।*
[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪০৯।*
[৮৫] *সূরা আন্-নিসা : ২৯।*
[৮৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৩, পৃ. ১৫৬।*
[৮৭] *তাফসীর আবু বক্র জাকারিয়া- সূরা আন্-নিসা, পৃ. ৯৮।*
[৮৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫৩।*
[৮৯] *সূরা আল-আহ্যা-ব : ২১।*
[৯০] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ভলি. ৭, পৃ. ২১০।*
[৯১] *তাফসীর আবু বক্র জাকারিয়া- সূরা আল-আহ্যা-ব, পৃ. ১৪৫।*
[৯২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৬।*

৪. পরিবার ও সামাজিক সংহতি: কুরআন পরিবারে সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখে এবং সমাজে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গড়ে তোলে।

কার্যকর উপায়: পরিবারে ও সমাজে কুরআনের নীতি অনুযায়ী আচরণ করুন, যেমন- সততা, সহানুভূতি ও ন্যায়পরায়ণতা।

৫. জ্ঞান, শিক্ষা ও চিন্তাশক্তি: কুরআন মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি বিকাশে উৎসাহ দেয়।

এটি শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষা নয়; বিজ্ঞান, ইতিহাস ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দেয়।

প্রস্তাব: নতুন কিছু শিখতে বা গবেষণা করতে কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা নিন।

৬. ধৈর্য, স্থিতিশীলতা ও আত্মনির্ভরতা: জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হলে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মেনে ধৈর্য ধারণ করলে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

অনুশীলন: প্রতিদিন একটি ধৈর্যশীল কাজ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করুন।

৭. আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া: কুরআন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পার্থিব জীবন সীমিত এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি অপরিহার্য। দৈনন্দিন কাজ ও সিদ্ধান্তে আখিরাতের মূল্য বিবেচনা করুন।

৮. বিজ্ঞান ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি: কুরআন প্রাকৃতিক ও মহাবিশ্বের নিখুঁত নিয়মের দিকে দৃষ্টি দেয়।

এটি যুক্তি ও প্রজ্ঞা বিকাশে সহায়ক।

অনুপ্রেরণা: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করুন এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা খুঁজুন।

৯. অর্থনীতি ও ব্যাবসায়িক সততা: কুরআন অর্থনৈতিক জীবনকে ন্যায্যতা ও সততার ভিত্তিতে পরিচালনার নির্দেশ দেয়।

পরামর্শ: ব্যবসা ও লেনদেনের সময় সততা, ন্যায় ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখুন।

১০. ক্ষমাশীলতা ও দ্বন্দ্ব সমাধান: কুরআন প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা ও সমাধানকে অগ্রাধিকার দেয়।

অনুশীলন: কোনো ব্যক্তিগত বা সামাজিক দ্বন্দ্বের সময় প্রথমে ক্ষমা প্রদর্শনের চেষ্টা করুন।

১১. মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়: কুরআন দারিদ্র্য, শিশু ও নারী অধিকার, সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

সুপরামর্শ: সমাজে অসহায় ও দূর্বলদের প্রতি সদয় হোন।

১২. পারিবারিক ও সামাজিক নৈতিক শিক্ষা: কুরআন পরিবারকে সঠিক আচরণ, দায়িত্ব ও পারস্পরিক সম্মান শেখায়।

পাঠকের জন্য নির্দেশ: পরিবারে কুরআনের আদর্শের ভিত্তিতে রোজকার আচরণ ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করুন।

১৩. সামাজিক সংহতি ও সহমর্মিতা: কুরআন সৌজন্য, সাহায্য, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

অনুপ্রেরণা: সমাজে সাম্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করুন।

১৪. আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনে ভারসাম্য: কুরআন পৃথিবী ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়।

নির্দেশনা: দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ও পার্থিব কাজের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রাখুন।

১৫. আত্মউন্নয়ন ও পরিশ্রম: কুরআন পরিশ্রম, উদ্যম ও উদ্যোগের মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব শেখায়। প্রতিদিন নিজেকে নতুন কিছু শেখার বা দক্ষতা অর্জনের চ্যালেঞ্জ দিন। যেমন- ➲ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, ➲ মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়, ➲ ক্ষমাশীলতা ও দ্বন্দ্ব সমাধান, ➲ অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক নীতি, ➲ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক যুগোপযোগী শিক্ষা।

পাঠকের জন্য মূল বার্তা: এই দিকগুলো দেখায় যে কুরআন কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দিশা ও নীতি।

নিয়মিত কুরআন তাদাব্বুর করুন: কেবল পাঠ নয়, অর্থ উপলব্ধি ও প্রয়োগে মনোযোগ দিন।

আদর্শ জীবন-ধারা গড়ে তুলুন: পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবনে কুরআনের নীতি বাস্তবায়ন করুন।

নিজেকে মূল্যায়ন করুন: দৈনন্দিন কাজ ও আচরণের সঙ্গে কুরআনের নীতি মিলিয়ে দেখুন।

জ্ঞানার্জন ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করুন: কুরআন ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিন্তা শক্তি উন্নত করুন।

আখিরাতকে মনে রাখুন: প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কাজের প্রভাব আখিরাতের সঙ্গে মিলিয়ে বিবেচনা করুন।

কুরআন হলো জীবনের সঙ্গী, দিশারী ও নীতি-নির্দেশিকা, যা মানুষের হৃদয়, মন, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

পাঠকের জন্য মূল বার্তা: কুরআন কেবল পাঠ করার জন্য নয়; বরং জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কুরআনের আলোকে জীবনধারায় রূপান্তরিত করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন।

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন:

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হু) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[ষষ্ঠ পর্ব]

তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে উপাস্থাপিত হলো–[১]

• **কুরআন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ–** ১। আল-মুগনী ফিত্ তাফসীর ৮১ খণ্ড, ২। যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর ৪র্থ খণ্ড, ৩। তাইসিরুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৪। তাযকিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গারিব, ৫। গারিবুল গারীব, ৬। নুযহাতুল 'উয়ূনিন-নাওয়াযিরা ফীল ওযূহি ওয়ান নাযায়ির, ৭। আর-ওযূহুন-নাওয়াযিরা ফী ফীল ওযূহি ওয়ান নাযায়ির, ৮। আল ইশারাতু ইলাল কিরাতিল মুখতার, ৯। তাযকিরাতুল মুনতাবাহ ফী 'উয়ূনিল মুশতাবাহ, ১০। ফুনূনুল আফনান ফী 'উয়ূনি 'উলূমিল কুরআন, ১১। ওয়ারদুল আগসান ফী ফুনূনিল আফনান, ১২। 'উমদাতুর রাসিখ ফী মা'রিফাতিল মানসূখ ওয়ান নাসিখ, ১৩। আল মুসফা বি-আকুফ্ফি আহলির রসূখ ফী 'ইলমিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ

• **উসূলুদ-দ্বীন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ–** ১৪। মুনতাকাদ আল মু'তাকাদ, ১৫। মিনাহাজুল উসূল ইলা 'ইলমিল উসূল, ১৬। বায়ানু গাফলাতিল কায়িল বি-কাদামি আফ'আলিল 'ইবাদ, ১৭। গাওয়ামিযুল ইলাহিয়্যাত, ১৮। মাসলাকুল আকল, ১৯। মিনাহাজু আহলিল ইসাবাহ, ২০। আস-সির আল-মাসূন, ২১। দাফ'উ শিবহিত তাশবীহ, ২২। আর-রাদ্দু 'আলাল মতা'আস্সাবুল আনীদ।

• **হাদীস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ–** ২৩। জামিউল মাসানিদ বিল খাস্সিল আসানিদ, ২৪। আল-হাদায়িক, ২৫। 'উয়ূনিল হিকায়াত, ২৬। আন-নুযহা, ২৭। আল-মুজতাবা, ২৮। আখায়িরুয যাখায়ির, ২৯। গারারুল আসর, ৩০। আল 'ইলাল আল-মুতানাহিয়া ফীল আহাদীসিল ওয়াহিয়া, ৩১। নাফীয়ান নাকল, ৩২। মুলতাকাদ আল হিকায়াত, ৩৩। ইরশাদুল মুরীদীন ফী হিকায়াতিল সালফিস সলিহীন, ৩৪। রাওযাতুন নাকির, ৩৫। আত্-তাহকীক ফী আহাদীসিল তা'লীক, ৩৬। আল মাদীহ, ৩৭। আল-মাওযূ'আত মিনাল আহাদীসিল মারফূ'আত, ৩৮। আল কাশফুল লি-মাশকালিস সাহীহাইন, ৩৯। আয যু'আফা ওয়ার মাতরুকীন, ৪০। 'আলামুল 'আলিম বা'দা রুসূখিহি বি-হাকায়িকি নাসিখিল হাদীস ওয়া মানসূখিহি, ৪১। ইখবারু আহলির রুসূখ ফিল ফিকহ ওয়া হাদীস বি-মিকদারিল মানসূখ মিনাল হাদীস, ৪২। আস সাহমু আল-মসীবু, ৪৩। আল-ফাওয়ায়িদু 'আনিশ শুযূখ, ৪৪। মানাকিবু আসহাবিল হাদীস, ৪৫। মাওতুল খাযর, ৪৬। মুখতাসার, ৪৭। আল-মাশীখা, ৪৮। আল-মুসালসালাত, ৪৯। আল মুহতাসাব ফিন নাসব, ৫০। তুহফাতুত তুল্লাব, ৫১। তানভীরু মুদলাহিমিশ শারফ, ৫২। আল-আলকাব, ৫৩। ফাযায়িলু 'উমার ইবনিল খাত্তাব, ৫৪। ফাযায়িলু 'উমার ইবনু আব্দিল আযীয, ৫৫। ফাযায়িলু সা'ঈদ ইবনিল মুসাইয়্যিব, ৫৬। ফাযায়িলু হাসান আল-বসরী, ৫৭। মানাকিবু আল-ফুযাইল ইবনু 'আইয়ায, ৫৮। মানাকিবু বিশরিল হাফি, ৫৯। মানাকিবু ইবরাহীম ইবনু আদহাম, ৬০। মানাকিবু সুফিয়ান আস-সাওরী, ৬১। মানাকিবু আহমাদ ইবনু হাম্বল, ৬২। মানকিবু মা'রুফ আল-কারখী, ৬৩। মানাকিবু রাবিয়াতু 'আদুবিয়াহ, ৬৪। মাসীরুল আযম আস-সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন, ৬৫। সফওয়াতুস সফওয়া, ৬৬। মিনহাজুল কাসিদীন, ৬৭। আল-মুখতার মিন আখবারিল আখইয়ার, ৬৮। আল কাতি'উ লি-মাহালিল লুজ্জাজ বি-মাহালিল হুজ্জাজ, ৬৯। 'উজালাতুল মুনতাযির লি শারহি হালিল খাযর, ৭০। আন নিসাউ ওয়া মা ইয়াতাআল্লাকু বি-আদাবিহিন্না, ৭১। 'ইলমুল হাদীস আল মানকুলু ফী আন্না আবা বকার আম্মার রাসূল, ৭২। আল-জাওহার, ৭৩। আল-মুগলাক।

• **ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ–** ৭৪। তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসর ফী 'উয়ূনিত তাওয়ারীখ ওয়াস সিয়ার,

---

* *প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।*

[১] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১ শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪; *ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১৪০-১৪২; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়া-নিহায়াহ্*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৭৫। আল মুনতাযাম ফী তারীকিল মলূক ওয়াল উমাম, ৭৬। শাযূরুল ‘উকুদ ফী তারীখিল মা‘হুদ, ৭৭। তরায়িফুয যরায়িফ ফী তারীখিস সাওয়ায়িফ, ৭৮। মানকিবু বাগদাদ।

• **ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ– ৭৯**। আল ইনসাব ফী মাসাইলিল খিলাফ, ৮০। জান্নাতুন নাযর ওয়া জুন্নাতুল ফিতর, ৮১। ম‘তাসার আল মুখতাসার ফী মাসায়িলিল নাযর, ৮২। ‘উমদুদ দালায়িল ফী মুশতাহিল মাসায়িল, ৮৩। আল-মাযহাব ফিল মাযহাব, ৮৪। মাসবূকুয যাহাব, ৮৫। আণ নাবযা, ৮৬। আল-‘ইবাদতুল খামস, ৮৭। আসবাবুল হিদায়াহ লি আরবাবিল বিদায়াহ, ৮৮। কাশফুর যুলমা ‘আনিল যিয়ায়ি ফী রাদ্দি দওয়া, ৮৯। রাদ্দুল লাওম ওয়ায যিয়াম।

• **ওয়া‘য বিষয়ক গ্রন্থসমূহ– ৯০**। আল-ইউয়াকীতু ফীল খাতব, ৯১। আল-মুনতাখাব ফীন নওয়াব, ৯২। মুনতাখাব আল মুনতাখাব, ৯৩। নাসীমুর রিয়াদ, ৯৪। আল-লু-লু, ৯৫। কানযুল মুযাক্কার, ৯৬। আল-আযজ, ৯৭। আল-লরতায়িফ, ৯৮। কানূযুর রামূয, ৯৯। আল-মুকতাবাস, ১০০। মাওয়ফিক আল মরাফিক, ১০১। শাহিদ ওয়া মাশহুদ, ১০২। ওয়াসিতাতিল ‘উকূদ মিন শাহিদ ওয়া মাশহুদ, ১০৩। আল-লাহব, ১০৪। আল-মুদহিশ, ১০৫। সবা নাজদ, ১০৬। মুহাদাসাতুল আকল, ১০৭। লরকতুল জামান, ১০৮। মা‘আনী আল-মা‘আনী, ১০৯। ফুতূহুল ফুতুহ, ১১০। আত-তা‘আযা আল-মুলূকিয়্যাহ, ১১১। আল আকদুল মুকীম, ১১২। ইকাযুল বিসনান মিনার রাকাদতি বি-আহওয়ালিল হাইওয়ান ওয়ান নাবাত, ১১৩। নাকতুল মাজালিস আল-বাদরিয়া, ১১৪। নুযহাতুল আদীব, ১১৫। মুনতাহা আল-মুনতাহা, ১১৬। তুবসিরাতুল মুবতাদা, ১১৭। আল-ইয়াকূতাতু, ১১৮। তুহফাযুর ওয়া‘য।

• **বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ– ১১৯**। যাম্মুল হাওয়া, ১২০। সায়দুল খাতির, ১২১। আহকামুল আশআর বি-আহকামরি ইশআর, ১২২। আল-কুস্সাস ওয়াল মুযাক্কিরীন, ১২৩। তাকবীমুল লিসান, ১২৪। আল-আযকিয়া, ১২৫। আল-হামকা, ১২৬। তালবীসু ইবলীস, ১২৭। লাকতুল মানি‘ঈ ফিত তিব্ব, ১২৮। আশ-শায়বু ওয়াল খিযাব, ১২৯। আ‘মারুল আ‘ইয়ান, ১৩০। আস-সিবাতু ‘ইনদাল মামাত, ১৩১। তানভীরুর গাবশি ফী ফাযলিস সাওদি ওয়াল হাবশি, ১৩২। আল হাচ্ছু ‘আলা হিফযিল ‘ইলমিল ওয়া যিক্‌রি কিবারিল হুফ্‌ফায, ১৩৩। আশরাফুল মওয়ালী, ১৩৪। ই‘লামুল আহইয়া বি-আগলাতিল ইহইয়া, ১৩৫। তাহরীমুল মাহলিল মাকরুহ, ১৩৬। আল-মিসবাহ লি দাও‘য়াতিল ইমামিল মুসতাযা, ১৩৭। আতফুল ‘উলামা ‘আলাল আমরি ওয়াল ‘উমরাহ্ ‘আলাল ‘উলামা, ১৩৮। আন নাসর ‘আলা মিসর, ১৩৯। আল-মাজদুল গাযদী, ১৪০। আল ফাজরিন নাওরী, ১৪১। মানাকিবুস সাতর আর রাফী, ১৪২। মা কিল্লাতুহু মিনাল আশ‘আর, ১৪৩। আল-মাকামাত, ১৪৪। মির রুসায়িল, ১৪৫। আত-তিব্ব আর-রুহানী, ১৪৬। বায়ানুল খাতা ওয়াস সওয়াব ‘আন আহাদীসিশ-শিহাব, ১৪৭। আল বায আল আশহাব আল মুনকায ‘আলা মান খলাফাল মাযহাব, ১৪৮। আল-ওয়াফা বি-ফাযায়িলিল মুস্তাফা, ১৪৯। আন্ নূর ফী ফাযায়িলিল আইয়াম ওয়াশ-শুহুর, ১৫০। তাক্বরীবুত তরীকিল আবআদ ফী ফাযায়িলি মাকবারি আহমাদ, ১৫১। মানাকিবুল ইমাম আশ-শাফি‘ঈ, ১৫২। আল ‘আযলাহ, ১৫৩। আর-রিয়াদ, ১৫৪। মিনহাজুল ইসাবাহ ফী মহাব্বাতিস সাহাবা, ১৫৫। ফুনূনুল আলবাব, ১৫৬। আয-যুরাফা ওয়াল মুতাহাবিন, ১৫৭। মানাকিবু আবি বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ১৫৮। মানাকিবু ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ১৫৯। ফাযায়িলুল আরাব, ১৬০। দুর্‌রাতুল ইকলীল ফীত তারীখ, ১৬১। আল আমসাল, ১৬২। আল-মানফা‘আতু ফীল মাযাহিবিল আরবা‘আহ, ১৬৩। আল-মুখতার ফীল আশ‘আর, ১৬৪। রুউসুর কাওয়ারির, ১৬৫। আল-মুরতাহাল ফিল ওয়া‘যি, ১৬৬। যাখীরাতুল ওয়ায়ি‘য, ১৬৭। আয-যাজরা আল-মাখুফ, ১৬৮। আল ইনসু ওয়াল মুহাব্বাতু, ১৬৯। আল-মতার্‌রাব ওয়াল মুলাহ্‌হাব, ১৭০। আয-যিনদুল ওয়ারী ফিল ওয়া‘যিন নাসির, ১৭১। আল ফাখির ফী আইয়ামিল ইমামিন নাসির, ১৭২। আল মাজদুস সলাহি, ১৭৩। লগতাতুল ফিকহ, ১৭৪। গারীবুল হাদীস, ১৭৫। মিলহুল হাদীস, ১৭৬। আল-ফুসূলুল ওয়ায়ি‘যাতি ‘আলা হারফিল মু‘জাম, ১৭৭। সালাওয়াতুল আহযান, ১৭৮। আল-মা‘শূক ফিল ওয়া‘যি, ১৭৯। আল-মাজালিসুল ইউসুফিয়্যাহ ফিল ওয়া‘যি, ১৮০। আল ওয়াযুর মাকবারি, ১৮১। কিয়ামুল লাইল, ১৮২। আল মুহাদাসা, ১৮৩। আল মুনাজাত, ১৮৪। যাহিরুল জাওয়াহির ফিল ওয়া‘যি, ১৮৫। কানযুল মুযাক্কার, ১৮৬। আন-নাজাতুল খাওয়াতীম, ১৮৭। আল-মুরতাকা লিমান ইরতাকা, ১৮৮। যায়নুল কাসাস, ১৮৯। নাসীমুর রিয়াদ, ১৯০। লিফতাতুল কাবিদ ফী নাসীহাতিল ওয়ালাদ, ১৯১। আল কারামাত।[১]

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

[১] *কিতাবুল মাওযূ‘আত মিনাল আহাদীসিল মারফূ‘আত- ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৭।*

أَفْكَارُ الْمُنَفَرِّدِ / নিভৃত ভাবনা:

ভূলুণ্ঠিত মানবতা ও কফিনবন্দী সভ্যতা

আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

মরিতে চাহি না আমি –সুন্দর ভূবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

বাঁচার জন্য প্রয়োজন মানবীয় পরিবেশ। কবি গুরুর হৃদয় নিংড়ানো পংক্তিদ্বয় আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। জাতীয়তাবাদের নামে বিশ্বময় তোলপাড় –রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুতেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বারের মতো ওই ধুঁয়া তুলে রিপাবলিকান ট্রাম্পের উত্থান বিশ্ববাসীকে বিপাকে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বন্ধ করতে এবং বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন ও ফ্রান্সসহ অন্তত ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল– শান্তিরক্ষা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, মানবাধিকার রক্ষা ও সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। এর সবগুলোই ছিল লালিত সভ্যতার বিকাশ সাধন ও বাসযোগ্য আকারে পৃথিবীটিকে গড়ে তোলা। কিন্তু ট্রাম্প সেই জাতীয়তাবাদের নামে ধোঁকা দিয়ে, বিশ্ববাসীকে বোকা বানিয়ে তার মর্জি মতো গড়ে তুলেছেন বোর্ড অব পিস্? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিপরীতে তার এ প্রয়াশ সন্দেহাতীতভাবে নিন্দার্হ। তিনি বলতে চাইছেন– বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ- সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যুদ্ধ ও সহিংসতা কমানো ও দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। বোর্ড অব পিস্ দিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠন, বিশেষভাবে গাজা অঞ্চলের পূনর্গঠন পরিকল্পনা তদারকি করা ও অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়তা করতে চাইছেন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ট্রাম্প। কথার ফুলঝুরিতে আরো আছে সুশাসন ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক সংঘাত সমাধানের আশ্বাস।

প্রায় ৮০ বছর পরে অর্থাৎ- ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারির প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অব পিস্ তিনি কেন করলেন? জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এর সবইতো ছিল। প্রতীয়মান হয় যে, তার উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। তাঁর একান্ত মদদে গাজাতে প্রায় ৮০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। এখনও সে ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত আছে। তিনি কীভাবে ওই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করবেন, বিশ্ববাসীর নিকট মোটেই বোধগম্য নয়।

হালে ২৮ অক্টোবর আকস্মিকভাবে ইরান আক্রমণ করে বিশ্ববাসীকে হতভম্ব করে তুলেছে। মিথ্যা ভাষণ ও উস্কানিতে আজ সারা মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে, আর তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বোর্ড অব পিস্! মূর্হুমূহু হামলা ও প্রতিহামলার কারণে হাজার বছরের লালিত সভ্যতা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সস্ত্রীক আটক করে আমেরিকা নিয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে দস্যুতার বিবর্ণ বিবরণ দৃষ্টে মানবতা আজ হতবাক। একটি স্বাধীন দেশের একজন প্রেসিডেন্টকে কী এইভাবে ছিনিয়ে নেয়া যায়? সার্বভৌম একটি দেশের প্রতি এমনিতরো আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। বোর্ড অব পিস্ গঠন করে তিনি চাইছেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এমনি হাস্যকর পদক্ষেপ পাগলেও বোঝে।

বিশ্বের ত্রাস ইসরাঈলের সাথে তার সখ্যতা নতুন কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটি যেন স্বতঃসিদ্ধ বৈদেশিক নীতি। সকল সরকার কর্তৃক এটি যত্নের সাথে অনসৃত হয়ে থাকে। ১৯১৭ সালে বেলফোর ডিক্লারেশনের আলোকে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পরপর ফিলিস্তিন অঞ্চলে কুক্ষিগত করার প্রয়াস চালায়। এতে পশ্চিমা বিশ্ব ইসরাঈলের পক্ষে সায় দেয় এবং ক্রমশঃ পশ্চিম তীর অবধি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে। এর সব প্রয়াস পরিকল্পনায় আমেরিকার নগ্ন হস্তক্ষেপ ছিল। আজও তারা ইসরাঈলের পক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্র ইরানকে নানা ছুতোয় ধ্বংস করার পায়তারা করছে।

২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাক আক্রমণের পেছনে কতিপয় অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে। তন্মধ্যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র যেমন রাসয়নিক ও জীবানু অস্ত্র, সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্ক, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি এবং তেল ও কৌশলগত স্বার্থসিদ্ধি অন্যতম। এমনিভাবে মিথ্যাচার ও প্রতারণার কুটকৌশল অবলম্বন করে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে অস্থির করে তুলেছে।

ইরান, ইসরাঈল ও গাজায় শত শত বিস্ফোরণে ব্যাপক ক্ষতিসাধন মানবতার প্রতি প্রকাশ্য হুমকি। এছাড়া আরব, বাহরাইন, কুয়েত, আরব আমিরাতে মার্কিন স্থাপনাগুলোর প্রতি হামলা লালিত সভ্যতা প্রতি যেন ভ্রূকুটি। এমনি অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্বে খাদ্য ও নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দিবে। সুতরাং বিশ্ববিবেককে এখনই সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোপানলে সব কিছুই হারাতে হবে। আর সম্ভাব্য চতুর্থ বিশ্ব যুদ্ধ লাগলে তা হবে লাঠি-সোটা ও ইট-পাটকেলের যুদ্ধ। অর্থাৎ- সৃষ্ট সভ্যতার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

أفكار اجتماعية / সমাজ চিন্তা:

পহেলা বৈশাখ: সংস্কৃতি না-কি চাপিয়ে দেয়া অপসংস্কৃতি!

মো. আব্দুল হাই*

কোনো জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার রুচিবোধ, তার গোড়ার কথা। সংস্কৃতির ধারকের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় তার অস্তিত্বের আলাপন। সুস্থ সংস্কৃতির মগ্নতায় তাড়িত হয় তার মন-মনন। যার মুগ্ধতা তাকে আপ্লুত রাখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এই সংস্কৃতিই পরিচয় করিয়ে দেয় তার জাতিস্বত্তার সাথে। এজন্যই সংস্কৃতিকে ধারণ করতে হয় খুঁব যত্নের সাথে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতি যদি হয় ধার করা, মিছে প্রলোভনে লুকিয়ে রাখা হয় কোনো এক মহা সত্যকে। তবে কি তাকে সংস্কৃতি বলতে পারি? অথবা, কোনো একটা হীন চক্রান্তকে আড়াল করতে খুব সুকৌশলে চাপিয়ে দেয়া হলে তখন তা হয় অপসংস্কৃতি। তার সাথে যদি যুক্ত হয় অশ্লীলতা, নষ্টতা, ভ্রষ্টতা তখন সেখানে বাসা বাঁধে জাহেলিয়াত। জাতিস্বত্তায় চলে মেরুকরণ। কোনো একটা সুসভ্য, উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সংস্কৃতির জন্য তা তৈরি করে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিনিয়ত তা হয়ে উঠে হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য "পহেলা বৈশাখ" উদযাপন এমনিই একটি অপসংস্কৃতি।

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির পরিচয়: সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সংজ্ঞায় 'বিশ্বাস, নৈতিকতা, মূল্যবোধ. জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সংস্কৃতির মূল অনুসঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার বিপরীত বা বিকৃত রূপই হলো অপসংস্কৃতি। যেকোনো জাতির সংস্কৃতি মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত এবং সেই জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণকে প্রতিফলিত করে।

পহেলা বৈশাখ! সংস্কৃতির অন্তরালে: একটা বিষয় খুবই স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি হবে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে। আর মুসলিম সংস্কৃতি হলো সর্ম্পূণরূপে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। যেখানে থাকবে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, সুসভ্য আচরণ ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ। আর আচার-আচরণ, যাপিত জীবন, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে অমুসলিম, কাফির-মুশরিকদের যাবতীয় আচার-আচরণের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তাদের কোনো উৎসবের দিন তারা নৈতিকতার সকল শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে দেয়। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে তারা লিপ্ত হয়। আর এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রধান অনুসঙ্গ হিসাবে থাকে মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়ার মতো ন্যাক্কারজনক বিষয়। আমাদের আলোচ্য পহেলা বৈশাখ কি এগুলো থেকে মুক্ত? অথচ, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনতো আর ১০টা দিনের মতোই। এই দিন পালনের মধ্যে বিশেষ কি কোনো তাৎপর্য, সাওয়াব বা পূর্ণতার কিছু আছে; বরং এই দিনকে ঘিরে প্রগতিশীলতার নামে চলে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা কিংবা অশ্লীলতা যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই দিন কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, দুঃখ কষ্ট দূর হয়, ব্যর্থতার গ্লানি মুছে যায় –এমন বিশ্বাস কি আমাদের ঈমানের সাথে যায়? ইসলাম কি এমন উদ্ভট তত্ত্বকে কোনোভাবে সমর্থন করে? বরং এটি যে আদিম যুগের প্রকৃতি, সূর্য পূজারীদের বিশ্বাস এটিও আমরা ভুলে যাই; সাময়িক আনন্দের খোঁজে। এক্ষেত্রে আমাদের অনেক স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবী জাতিসত্তার দোহাই দিয়ে বাঙালি সাজার চেষ্টা করে, মুখে বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে, বাঙালিত্বকে ধারণ করার বুলি আওড়ায়, কিন্তু মর্যাদার ক্ষেত্রে আদৌও কি তারা সেটা করে? অথচ, এরাই আবার সারা বছর চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে ভারতীয়, পশ্চিমা কালচার লালন করে। হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্য ও বাংলা ভাষা তাদের কাছে বরাবরই উপেক্ষিত। মূলত তারা মুখে বাঙালি, ফ্যাশনে হিন্দুয়ানী, যাপিত আচরণে পশ্চিমা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূজিবাদকে লালন করে। যেমন- আজো অফিস-আদালত, দিন-মাস তারিখসহ জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজিকে ধারণ করে চলছে। এটি যে কতবড় একটা প্রহসন, যখন দেখি রক্তের বিনিময়ে পাওয়া মাতৃভাষার দিনটিকেও উদযাপন করে হালের এই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী। এটি চরম পরিহাস ছাড়া আর কি হতে পারে?

আবার দেখি, আমাদের দেশের কিছু মাথামোটা প্রগতির দাবিদার এই পহেলা বৈশাখকে 'আবহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতি' বলে জোর দাবি জানায়। তাই এই দিবসকে তাদের সাজানো ছক অনুযায়ী পালন করতে তারা বদ্ধ পরিকর। তাই তারা মঙ্গল শোভাযাত্রা, বিভিন্ন ধরনের হিন্দু দেবদেবীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিক ব্যবহার করে থাকে। অথচ, এই মঙ্গল শোভাযাত্রা নামক অদ্ভুত উৎসব গত ৩ দশক আগেই বিদ্যমান ছিলো না। মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল কন্সেপ্টই যেখানে লুকিয়ে আছে 'অশুর' নামক এক অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করার মাঝে। যা মূলত হিন্দুদের প্রধান দেবী দূর্গা করে থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। তারা এও বিশ্বাস করে যে হিন্দুধর্মের অন্যতম দেবতা 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মই হয়েছে এই 'অশুর'কে বধ বা ধ্বংস করার জন্য। আসুন দেখি, কতটা নগ্নভাবে এই প্রগতিশীলরা হিন্দুয়ানী কালচারকে 'আবহমান সংস্কৃতি' বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

ক) পহেলা বৈশাখকে স্বাগত জানানোই হয় শির্কী কর্মকাণ্ড দিয়ে– 'সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সূর্য দেবতাকে পূজা করার মাধ্যমে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনো সূর্যকে পূজা করার রীতি বিদ্যমান। যেমন- খ্রিষ্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় "অ্যাটোনিসম" মতবাদে সূর্যের উপাসনা চলত। এমনিভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীদেরকে পাওয়া যায়। যীশু খ্রিষ্টের কাল্পনিক জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বরও মূলত এসেছে রোমক সৌর-পূজারীদের পৌত্তলিক ধর্ম থেকে। ১৯ শতাব্দীর উত্তর-আমেরিকায় কিছু সম্প্রদায় গ্রীষ্মের প্রাক্কালে পালন করত সৌর-নৃত্য। মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির সাথে আবদ্ধ করে তাদেরকে শির্ক বা অংশীদারিত্বে লিপ্ত করানো শয়তানের সুপ্রাচীন "ক্লাসিকাল ট্রিক" বলা চলে।[৯৫]

শয়তানের এমন কূটচালের বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে তুলে ধরেছেন এভাবে:

﴿وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾

"আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখেছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদাহ্ করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভনীয় করেছে।"[৯৬]

খ) বৈশাখকে স্বাগত জানানো হয় এভাবে "এসো হে বৈশাখ! এসো এসো। 'দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো" ইত্যাদি সম্ভাষণ দ্বারা। যা মূলতঃ আদিম যুগের সূর্য পূজারী ও প্রকৃতি পূজারীদের রীতিনীতি যা স্পষ্ট শির্কের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল করার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"তাদের অশুভ আলামতের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই কাছে রয়েছে। অথচ তাদের অধিকাংশই জানে না।"[৯৭]

গ) ইসলাম সমর্থিত দিনগুলো ছাড়া অন্য কোনো দিনে বিশেষ কোনো কল্যাণ, দুঃখ, কষ্ট, জরা, অগ্নিস্নানে সূচি হবে ধরা তথা পৃথিবী এটি যে কত বড় শির্কী কথা তা সহজেই অনুমেয়। এই বিশ্বাসকে ধারণ করলে আমাদের ঈমান কি ঠিক থাকবে? ইসলামে কি এর সমর্থন আছে? অথচ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি ধর্মীয় উপলক্ষ্যে বা 'ইবাদত পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করবে। সুতরাং তারা যেনো তোমার সাথে এ ব্যাপারে বির্তক না করে। তুমি তাদেরকে তোমার রবের দিকে আহ্বান করো, তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।"[৯৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।"[৯৯]

এই শয়তানী উৎসবে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো হিন্দুদের বিভিন্ন দেবতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- ইঁদুর- গণেশের বাহন, হনুমান- রামের বাহন, হাঁস- সরস্বতীর বাহন, সিংহ- দূর্গার বাহন, ময়ূর- কার্তিকের বাহন, গাভী- রামের সহযোগি, সূর্য- দেবতার প্রতীক, পেঁচা- লক্ষ্মীর বাহন ও মঙ্গলের প্রতীক, বিষ্ণুর বাহন হলো ঈগল। এছাড়াও শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত 'মুখোশ' ও মূর্তিগুলো হিন্দুদের কোনো না কোনো বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। এমতাবস্থায় চিন্তাশীলদের বলছি, সত্যিই কি আমরা বাঙালি সংস্কৃতিকে পালন করছি। নাকি সাংস্কৃতির আগ্রাসনে চাপিয়ে দেয়া হিন্দুধর্ম চর্চা করছি?

---

* *সাবেক সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। প্রভাষক (ইংরেজি বিভাগ)- পহরচাঁদা ফাযিল মাদরাসা, চকরিয়া, কক্সবাজার।*

[৯৫] *https://quraneralo.com/banglanewyear/।*

[৯৬] *সূরা আন্ নামল: ২৪।*

[৯৭] *সূরা আল-আ'রাফ : ১৩১।*

[৯৮] *সূরা আল-হাজ্জ: ৬৭।*

[৯৯] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪৮।*

একটা কথা স্পষ্ট করে মনে রাখা কর্তব্য যে, আমাদের দেশে আমরা পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান পালনের জন্য যা করছি এটি কোনোভাবেই চিরায়ত বাঙালী সংস্কৃতি নয়। বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি তো নয়ই। কারণ পহেলা বৈশাখে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তার সবগুলোই হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে নেয়া। আর হিন্দু তথা মুশরিকদের কোনো সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির দূরতমও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই উৎসবকে স্বাগত জানানোর নাম করে পটকা ফুটিয়ে, আতশবাজি পুড়িয়ে, গভীর রাত পর্যন্ত তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খল সহবস্থান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করা, গান বাজনা, হৈ-হুল্লোর করে সময় কাটানো কোন সভ্য সমাজে আছে? শুধু তাই নয়, ক্লাবে ক্লাবে অশ্লীলতা, নেশায় বুঁধ হয়ে যাওয়া, মদ্যপান, নোংরামী, ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হওয়া, রেডিও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, 'রাশিফলের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা এগুলো কি কোনো সুস্থ বিবেকের কাজ?

আমরা আরো একটি বিষয় পরিস্কার করে বলতে চাই, এখানে যেমন দূরভিসন্ধি খোঁজ করা অবান্তর, তেমনি এটি নিয়ে রাজনীতি করাও কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। কারণ ইসলামে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাও দেখিয়েছে সবচেয়ে বেশি। আর আবহমান কাল থেকেই বাঙালি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠী যেভাবে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে, সম্প্রীতির সাথে যেভাবে পালন করে আসছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় নযীরবিহীন।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, হিন্দু তথা মুশরিকদের সংস্কৃতিকে ঢালাওভাবে বাঙালি সংস্কৃতি বলে চাপিয়ে দেয়া হবে। যদি কেউ এটিকে সরাসরি হিন্দুদের সংস্কৃতি বলে, তবে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। যেমন- থাকে না তাদের দূর্গাপূজা, স্বরস্বতী পূজা, কালী পূজাসহ বিভিন্ন পূজা পার্বনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি তাদের সংস্কৃতির একটি অংশকে ঢালাওভাবে গোটা জাতির সংস্কৃতি বলে চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে এখানে শুধু আপত্তি নয়, ঘোর আপত্তিসহ আমরা এর প্রতিবাদ জানাই। সেই সাথে কোনো এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বা উৎসবকে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করা বা চাপিয়ে দেয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য মনে করি না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম হলো তার যাবতীয় কার্যক্রম পালন হবে শির্ক ও বিদ'আতমুক্ত। কারণ, এই দু'টো অপরাধ এতো মারাত্মক যে এগুলোর অনুশীলন করলে তা কোনোভাবেই 'ইবাদত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর মুসলিমদের যাবতীয় কাজই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই 'ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো– উৎসবের নামে মুসলিমদের জন্য এসব প্রতীকের ব্যবহার আদৌ কাম্য কি? অথবা এগুলো কি শরী'আতসম্মত বা শির্ক বিদ'আতমুক্ত? ভেবে দেখা দরকার।[১০০] অথচ এরকম একটি নোংরা ও শির্কপূর্ণ সংস্কৃতিকে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিঙ মিডিয়া ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্নভাবে প্রচার করে একে জাতীয় দিবসে রূপান্তরের চেষ্টায় লিপ্ত। আর তারা এই বিষয়টিকে প্রলেপ দেয়ার জন্য বলে থাকে– "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।" কিন্তু আমরা আমাদের বিবেকবান ভাইবোনদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, মুসলিম হিসাবে আমরা কি হিন্দুদের পূজা-পার্বণের মতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব– যখন এসব অনুষ্ঠানের সাথে শির্ক বা অংশীদারিত্ব জড়িয়ে আছে? অথচ মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হলো, শরী'আত বিরোধী বিশেষ করে শির্ক ও বিদ'আত মিশ্রিত সকল পথ ও পদ্ধতিকে পরিহার করে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে জীবন পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে কোনো ছাড়ের বা কাটছাটের সুযোগ নেই। এটা আমাদের ভাবনায় থাকা দরকার।

বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গের দিকে নযর দিতে চাই– কথিত বাঙালি সংস্কৃতির ধারক বলে যারা বছরের এই দিনে সাম্য, মৈত্রী, আর মানবতার কল্যাণের জন্য শপথ নেয়, ভ্রাতৃত্বের কথা বলে বড় বড় বুলি আওড়ায়, তারাই এই দিনে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিলাশী "পান্তা-ইলিশ" খাওয়ার অসম প্রতিযোগিতায় নেমে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত দরিদ্র তথা "নুন আনতে পান্তা ফুরায়" শ্রেণীর সাথে এক নিষ্ঠুর, রসিকতায় মেতে উঠে– যা হাস্যকর প্রহসন বটে!

এছাড়া যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই, ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কোনোভাবেই সমর্থন করে না। উপরন্তু তা যদি হয়, কোনো বিজাতীয় সংস্কৃতির ডামাডোলে তাতো আরো ভয়ঙ্কর। কারণ এসব

[১০০] *সংস্কৃতির রূপান্তর- শাহ আব্দুল হালিম, নয়া দিগন্ত, ৪ ফেব্রুয়ারি-২০১৬, পৃ. ৭।*

সংস্কৃতির সাথেই জড়িয়ে আছে নগ্নতা, উলঙ্গপনা, বেলেল্লাপনার মতো খারাপ দৃষ্টান্ত আর প্রগতিশীলতার নামে উদ্দাম অশ্লীলতা। চলুন এই নোংরা সংস্কৃতির কিছু ভয়াবহ বাস্তব চিত্র নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। পহেলা বৈশাখ তথা বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গায় ভয়ংকর অপরাধ, পাপাচার, নোংরামীর এক পসরা সাজায় একদল বিভ্রান্ত মানুষ। শুরুটা হয় সেই রমনার বটমূল থেকে। আমরা দেখি নানান জায়গায় নানান রকমের অশ্লীল বিজ্ঞাপণ, মাইকিং করে মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর এসব তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো জুয়া, নেশা ও নাচ গানের আসর। দিনব্যাপী, সপ্তাহব্যাপী এমনকি মাসব্যাপী চলমান এসব জুয়া ও মেলার আসরে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চলে, বিভিন্ন জায়গায় মদ, গাজা বা অন্যান্য নেশাদার দ্রব্যের দিব্যি কেনাবেচা চলে। বিশেষ করে কিছু মাজার, গানের আসর তো এর জন্যই বিখ্যাত। কুষ্টিয়ার লালনের মাজার যার বাস্তব নমুনা। আর রাতভর উচ্চ আওয়াজে নাচ, গানসহ চরম অশ্লীলতায় ভরপুর থাকে এসব মঞ্চ। যা হাজারো যুবককে নিঃশ্ব করে দেয়, স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয় সম্ভাবনাময় অসংখ্য যুবকের। আর চরিত্র হননের এক অসম প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে তথাকথিত প্রগতিশীলরা।

আমাদের আহ্বান! হে তরুণ তোমার কাছে। টালমাটাল ঈমান আর লক্ষ্যে অলক্ষ্যে হাজারো ফিৎনার আক্রমণে বিপর্যস্ত পথিক তুমি! একটিবার ভাবো, একটু চিন্তা করো! নিজের সুস্থ বিবেকের কাছে সপেঁ দাও তোমার প্রগতিশীলতার অসুস্থ হৃদয়কে। তোমার মনোজগতে ক্ষণে ক্ষণে আঘাত করা বিবেকের দংশনকে মূল্যায়ণ করো। কতশত অপরাধের ফিরিস্তি তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে! সেগুলো কি তোমার স্বত্তাকে জাগিয়ে দেয় না? হয়তো তোমার পরিবার, আপনজন, বন্ধু-বান্ধবের কতজন হারিয়ে গেলো এমন নোংরামীর পঙ্কিল কর্দমায়। যারা জুয়ার আসরে সব হারিয়ে নিঃশ্ব আজ তারাও তো তোমার কোনো না কোনো আপনজন! যে যুবকটি ভয়ংকর নেশার ফাঁদে পরে তার অমিত সম্ভাবনাময় যৌবনকে ধ্বংস করে দিতে চায় সেও তো তোমার চিরচেনা জন। যে যুবকটি অশ্লীল বাদ্য-বাজনা, গানের তালে তার হিমাদ্রীসম দৃঢ় চরিত্রকে ভঙ্গুরতায় মেশাতে যাচ্ছে খুঁজে দেখো প্রিয় ভাই সেও তোমার হয়তো ঘনিষ্ট কেউ। তুমি কি এখনো চুপ থাকবে? নিরবতায় কাটাবে তোমার দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে। জবাবদিহিতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাও তুমি অভাগার মতো! জুয়া, গানের আসর, যাত্রাপালা, নেশার অবাধ প্রসারেও তুমি নিশ্চুপ! যে তরুণ-তরুণীটি জীবনের অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলছে তাদের জন্য কি তোমার কিছুই করার নেই। তুমি কি দেখছো না কত মুসলিম যুবক মুশরিকদের উৎসবকে ধারণ করে অন্ধকারে হারাতে চায় তাদেরকে আলোতে ফেরাবে কে? ধর্মহীনতার গভীর চোরাবালিতে যারা তলিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে টেনে তুলবে কে? এই যে প্রতিনিয়ত তুমি এই দু'আ পাঠ করো, কিন্তু তার বিপরীতে অন্যের কাছে তোমার চাওয়া-পাওয়া, মঙ্গল কামনা তবুও কি তুমি জাগবে না।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থাৎ- এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সার্বভোমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোনো সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।[১০১]

হে ভাবুক মন! তুমি যখন নির্ভার হয়ে প্রগতিশীলতার নাম করে বিজাতীয় কালচারকে ধারণ করো, তোমার মন কি তখন লজ্জায় একটিবার কুণ্ঠিতও হয় না? তুমি কি জানো না ধুতি, নেংটি, রাখী ইত্যাদির যে প্রচলন তা স্পষ্টতঃ হিন্দুদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি। তুমি যাতে মেতে আছো তার প্রতি পদে পথে অশ্লীলতা, বেহায়াপনার হাতছানী। এই যে একদিনের তথাকথিত চিরায়ত সংস্কৃতি পালন করতে গিয়ে ঢোল-তবলার তালে ছেলে-মেয়ে একসাথে নেচে গেয়ে, রং ছড়িয়ে, উল্কি একে, বিভিন্ন পশু-পাখির মুখোশ পরে যেভাবে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছো তা কি কোনোভাবেই ভদ্রজনচিত? তোমার কর্ণকুহরে কি কুরআন সুন্নাহ'র পবিত্র বাণীগুলো পৌঁছায় না? এসো দেখে নাও কিছু অমোঘবানী।

ক) মঙ্গল শোভাযাত্রা, সূর্যের পূজা, দেবতাদের বিভিন্ন বাহন

স্পষ্ট শির্ক: মহান আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

[১০১] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৮০৪।*

"নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর তার বাসস্থান হবে অগ্নি এবং যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১০২]

খ) অশ্লীলতা, মদ জুয়া, বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমার উম্মাতের কিছু লোক এমন হবে, যারা যিনা, সিল্ক, (পুরুষের জন্য) মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।"[১০৩]

গ) মুসলমানের ভালোমন্দ, চাওয়া-পাওয়া, 'ইবাদত-বন্দেগী শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই। দেখুন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"জিন্ ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার 'ইবাদত করবে।"[১০৪]

হে চিন্তাশীল! যুগে যুগে তথাকথিত প্রগতিশীল বাতিলপন্থীরা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর অপবাদের খড়গহস্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত প্রচেষ্টাতেও তারা তোমাদের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারেনি। তাইতো তারা কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তোমার উপর অপসংস্কৃতির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। যার সাময়িক উন্মাদনায় তুমি আপ্লুত। হয়তো তুমি না জেনেই এমন নোংরা, বর্বরোচিত, তথাকথিত প্রগতিশীল শিরকী কর্মকাণ্ডে ভরপুর এমন উৎসবের প্রতি উৎসাহ বোধ করো। এমনটি করলে বলতেই হবে যে, তুমি অনুভূতিশূন্য প্রাণী, জড় পদার্থের ন্যায় তোমার আচরণ। অথবা তুমি নিফাকীর মতো দোষে দুষ্ট।

অতএব হে সত্যের ঝাণ্ডাবাহী! সূরা আ-লি-'ইমরান-এর ১০৪ নং আয়াতের নির্দেশনা মোতাবেক তোমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে এগিয়ে আসতে হবে এমন অপসংস্কৃতির প্রতিরোধকল্পে। কারণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তোমরা মুসলিম। আর এই একটি মাত্র পরিচয়ই তোমাদেরকে সকল অন্যায়-অনাচার, ভণ্ডামী-পাপাচার, শঠতা-প্রবঞ্চনা, দৈন্যতা-সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করবে। তাই এসো! আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা যেন উল্লসিত না হই এমন দিনে, কোনোভাবেই যেন অংশগ্রহণ না করি এমন উৎসবে। শুধু তাই নয়, বন্ধুদের, বোনদের, সর্বোপরি কাছের মানুষদের যেন সাবধান করি, অনুভূতি শূন্য হয়ে যেন জড়িয়ে না পড়ি এমন নিষ্ঠুর শিরকপূর্ণ উৎসবে।

হে প্রিয় সত্যানুসন্ধানী!

তোমরা যে আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে তোমাদের হৃদয়ে ধারণ করো, তার আলোকচ্ছটা যে দীপ্তিমান নক্ষত্রের ন্যায়। আর তার তেজোদীপ্ত আলোকময় জ্যোতিতে সকল অন্যায়, অবিচার, আর অসত্য অপসারিত হয়ে ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে বিশ্বজাহান। সেই সাথে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসে কৃত সংকল্পে অটুট থাকো এই ভেবে যে, পদানত হবে সকল অপসংস্কৃতি, আর উড্ডীন হবে নিষ্কলুস আদর্শ সংস্কৃতির ঝাণ্ডা। মহান আল্লাহকে ভয় করো। তার অবাধ্যতার ফলাফল সম্পর্কে সর্তক হও। শয়তানের কুটচালগুলোর প্রতিরোধকল্পে সংকল্পবদ্ধ হও। তোমার অবস্থান যেনো কোনোভাবেই রাসূল (ﷺ)-এর সেই সর্তকবাণীর তালিকায় না পড়ো, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল বলে জ্ঞান করবে।"[১০৫]

এই যে কঠোর সর্তকবার্তা যেখানে রয়েছে শিরকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, নগ্নতা, অশ্লীলতায় ভরপুর, বাদ্যযন্ত্রে পূর্ণ, আর অনর্থক বাজে কাজে, সময় অপচয় তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কি করবে না? এসো তবে তোমার পরিবার, সমাজ, বন্ধুবান্ধবকে সত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য দিয়ে সর্তক করো। আর পূর্বে যা ভুল করেছো তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। এই যে দেখো ক্ষমার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য কি প্রস্তুত রেখেছেন।

﴿وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।"[১০৬]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

[১০২] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৭২।*
[১০৩] *সহীহুল বুখারী- ২/৮৩৭ পৃ.।*
[১০৪] *সূরা আয্-যা-রি'আ-ত : ৫৬।*
[১০৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৯০।*
[১০৬] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৩৩।*

قصيدة / কবিতা

তাওহীদীবাদ জিন্দাবাদ

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

এক মহান আল্লাহর নামেই শুরু,
এক মহান আল্লাহতেই শেষ,
ভাঙুক সব মিথ্যার শেকল,
তাওহীদ হোক একমাত্র দেশ।
নেই কোনো রব আসমানে-জমিনে
তিনি ছাড়া আর কেউ,
মাথা নত করি শুধু তাঁরই কাছে,
এই তো মু'মিনের চিহ্ন সত্য ও নব্য।
ভাঙো মূর্তি অন্তরের ভেতর,
ভাঙো ভয়, ভাঙো লোভ,
তাওহীদের ডাক উঠুক বুকে,
জাগুক ঈমানের শোভ।
কবর, পীর, তাবিজ নয়
ভরসা শুধু রব্বুল 'আলামিন,
যার কুদরতে চলে বিশ্বচরাচর,
তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহান।
ইবরাহীমের আগুন জ্বালায়,
মূসার লাঠি কথা কয়,
মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দা'ওয়াত আজও
শির্কের বুক চিরে জয়।
তাওহীদ মানে আপস নয়,
তাওহীদ মানে দৃঢ় শপথ,
যুল্মের বিরুদ্ধে সত্যের পথে
চলার নামই তাওহীদ রথ।
এসো তরুণ, এসো বৃদ্ধ,
এক কাতারে দাঁড়াও আজ,
আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো গোলাম নই
এই হোক আমাদের আওয়াজ।
জীবন-মরণ তাঁরই হাতে,
তাঁরই জন্য লড়াই,
তাওহীদীবাদ জিন্দাবাদ
এই স্লোগানেই মাথা উঁচু তাই।

** মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

বৈশাখ তুমি কার?

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

হে বৈশাখ! তুমি আমার চির চেনা
প্রতি বছর তোমাকে দেখি–
তুমি গ্রীষ্মের প্রতীক, মৃত্তিকা ফাটা উষ্ণকল্লোল
ভয়াবহ আতংক লণ্ডভণ্ড নির্মম সর্বনাশা
উড়ে নাও ভেঙ্গে চুড়ে দাও
পথজনের চটশিবির গরীবের কুঁড়েঘর
তুমি কাল নাগিনী কালবৈশাখী ঝড়।
ওরা বলে, তুমি মুছে দাও গতবর্ষের
দুঃখকষ্ট আবর্জনা
শুচি করো ধরা ঘুচে দাও জরা বলে
খ্যাতিমান–
না, আমি এভাবে বলতে পারব না
কারণ, আমি তো মুসলমান।
তোমার নামেই বেহায়াপনা কত উৎসব!
ইলিশ কুরবানী!
কত খেলা! কত মেলা প্রদর্শনী অশ্লীল
অনুষ্ঠান!
আচ্ছা, তুমিই বলো, তোমাকে বলতেই
হবে! তুমি কার?
তালে তাল মিলাতে আমি পারবো
না, আমি কি অন্ধ কবি?
এসব দেখে, মন যমুনায় অসহ্য ঢেউ
কলিজা হয়ে যায় ছারখার
শির্ক বিদআতকে যমের চেয়ে বেশি ভয় পাই!
কারণ, আমি মুসলিম।
সবকিছুর বিনিময়ে বেহেশ্‌ত চাই।

সংহতি বৈশাখ

ইমরান হোসেন রাহাত খান*

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আদিম প্রহরে জাগিল যে সুর-বীণ,
প্রকৃতি-বন্দনা-রসে সিক্ত ছিল সে অনাদি দিন।
সূর্য-অগ্নি-বারিধারার সনে ফসলের আরাধনা,
বাঙালির হৃদে অঙ্কিত ছিল শাশ্বত আলপনা।

আকবর শাহ টানিল যে ভাই ফসলি সনের ডোর,
খাজনা দিতে চাষার মনে ফুটল রঙিন ভোর।

** সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ্ সুলতান (রহিমাহুল্লাহ) কামিল মাদ্‌রাসা গোদাগাড়ী। বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, তানোর, রাজশাহী।*

** প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, বি আই টি কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাই স্কুল, বধুঠাকুরানী, বরগুনা। বিজ্ঞান ও সাহিত্য গবেষক। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনাকারক। অধ্যয়নরত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

নৃপতি ও প্রজা মিলনে নামিল বৈশাখী জয়গান,
জীর্ণ প্রথাও উৎসবে পেল মুক্তির পরম ত্রাণ।

গ্রাম-বাংলার মেলায় মেলায় রঙিন শাড়ির ছটা,
মায়েদের মাথায় ঘোমটা খানি– অপরূপা এক ঘটা।
পায়েতে আলতা, নূপুর-নিক্কণ, হাতে রেশমি চুড়ি,
পাহাড়ি ঝর্ণার কলতানে যেন খুশির রঙিন ঘুড়ি।

কপালে লাল টিপ আর হাতে শঙ্খ-চুড়ির হাসি,
বাঁশের বাঁশিতে বাজে সুরে মধুর বারোমাসি।
গরম জিলিপি, রসাল মুড়লি, মচমচে গজা-খই,
মাটির সানকিতে ঘন পায়েস আর পাতিল ভরা দই।

আতর-গোলাপের ম ম ঘ্রাণে মুখর চারিপাশ,
বড়দের পায়ে সালাম ঠুকে কাটে খুশির বারো মাস।
তপ্ত দুপুরে ডাবের জল আর বেলের শরবত খানি,
তৃষ্ণা মেটায় প্রাণের উৎসবে– এ যেন অমৃত বাণী।

বায়োস্কোপে দেশ-বিদেশের রঙের কারসাজি,
মাটির ব্যাংক আর শোলার পাখিতে শৈশব হয় রাজি।
কুস্তি লড়াই আর বীরের বেশে লাঠি খেলার দাপট,
হৃদয় নাচে ঢাকের তালের বলীয়ান জাদুকপট।

পাটের শিকা, ডালি-কুলা আর বাঁশের ঝুড়ির কাজ,
মায়েদের হাতের আলপনাতে সাজে মেলার সাজ।
ঝালমুড়ি আর আচারের ঘ্রাণে জিভে আসে জল,
পান্তা-ইলিশের কাঁচা লঙ্কা– ঐতিহ্যের এই বল।

মাটির সরায় রঙের কাজ আর লক্ষ্মীর ওই হাঁড়ি,
শোলার কদম ফুলের গন্ধে সাজে মেলার বাড়ি।
রঙিন বেলুন ওড়ে আকাশে, হাতে তালপাতার পাখা,
শৈশবের সেই দিনগুলো সব হৃদয়ে আছে আঁকা।

সার্কাসের ওই জাদুর খেলা, মরণকূপের টান,
মোটরসাইকেল চক্কর দেয়– থমকে সবার প্রাণ।
কাঁসা-পিতলের বাসন ভাণ্ড, মাটির সরা চিত্র,
নকশিকাঁথার ভাঁজে ভাঁজে গভীর প্রেমের মিত্র।

নাগরদোলার চক্কর ঘোরে, কলিজা করে দুরুদুরু,
ঐকতানের সুর লহরী মেলার গহীন শুরু।
পিঁপড়ে-পুতুলের নাচন দেখে ছোটদের মনে ধক,
চরকি ঘোরে সাঁইসাঁই করে, নেইকো কোনো থক।

মাঠের কোণে কাদা খেলা আর রঙিন চরকির মেলা,
মুড়লি-কদমা-গজা-বাতাসায় কাটে সারাবেলা।
চিড়া-মুড়ির মোয়া আর মচমচে সেই নিমকি,
মাঠের ধুলোয় শৈশব নাচে– নেইকো কোনো ধমকি।

মাটির ব্যাংকে জমানো কড়ি, তালপাতার ওই বাঁশি,
সাঁতার লড়াই, লাঠি খেলায় গ্রাম্য বীরের হাসি।
কাঠের ঘোড়া, রঙিন পাখা, শোলার তৈরি পাখি,
মেলার ধুলোয় স্মৃতিরা সব দিচ্ছে যেন উঁকি।

কাঁচের চুড়ির রিনঝিন শব্দে মুখরিত চারিপাশ,
শোলার পাখির ডানায় ওড়ে বাঙালির নীল আকাশ।
ঢাক-ঢোলের ওই গুরুগুরু নাদে গ্রাম-শহর মুখর,
নাগরদোলা ঘোরে শোঁ-শোঁ রবে, তুঙ্গে খুশির ঝড়।

আকাশ পানে হাত বাড়িয়ে ঘুরছে নাগরদোলা,
ছোট-বড় সবার মনে আনন্দ বাঁধভাঙা খোলা।
পুতুল নাচের ছন্দে ঘোরে স্বপ্নের সেই মায়া,
বটের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে শান্ত শীতল কায়া।

পান্তা-ভর্তা আর শুঁটকির ঘ্রাণে ম ম করে পাড়া,
মাটির সানকি হাতে বাঙালি আজ খুশিতে আত্মহারা।
নাটাই-ঘুড়ির সুতো কেটে যায় দূর অজানার পানে,
পিঠা-পুলির ঘ্রাণ মিশে যায় বৈশাখী সব গানে।

মেলার শেষে বাড়ি ফিরে দেখি পায়ের পায়েস-রসে,
সবার মুখে হাসি ফুটেছে নতুন আশার বশে।
নৌকা বাইচে দাঁড়ের টানে কাঁপিল গহীন থর,
বাঁশের বাঁশির মিষ্টি সুরে মেলা প্রাঙ্গণ মায়ায় বিভোর।

মেলাতে লড়াই– ষাঁড়ের লড়াই, হাডুডু আর দাপট,
পুরষেরা ভাঙে হাঁড়ি লয়ে হাতে রণজয়ী ঝাপট।
মা-বোনেদের সেই বালিশ লুকানো, হাসির কলতান,
মাটির হাঁড়ি আর কারুকাজে জাগে ঐতিহ্যের প্রাণ।

এই মেলাতেই শিখিয়াছে জাতি– হইব না কভু নত,
সংহতি জোরে জয় করি মোরা বাধা ও বিপত্তি যত।
বায়ান্নতে শোণিত দিয়াছি, চুয়ান্নতে জয়,
চৌষট্টি আর ছেষট্টিতে ঘুচিল মনের ভয়।

হঠাৎ আকাশ মেঘলা করে আসে কালবৈশাখী ঝড়,
উড়িয়ে নেয় সব জীর্ণ-পুরানো, কাঁপায় অম্বর।
অন্যায়ের ওই প্রাসাদ ভেঙে হয় সে চুরমার,
নতুন ভোরে জাগে পৃথিবী– ঘুচে যায় হাহাকার।

ঊনসত্তরের গণজাগরণ, একাত্তরের রণ,
মুক্তির বীজ বুনেছি মোরা বৈশাখী ওই ক্ষণ।
চব্বিশের সেই ছাত্র-জনতার বজ্রকঠিন নাদ,
ঐক্যবলেই চূর্ণ করেছি স্বৈরাচারের খাদ।

শুদ্ধ হয়ে বাঁচুক মানুষ, জাগুক মুক্ত প্রাণ,
বৈশাখী ওই রুদ্র ঝড়ে উড়ুক বিজয়ী নিশান!

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***রমাযানের কাযা আগে আদায় করতে হবে না-কি শাওয়ালের রোযা আগে রাখা যাবে বিস্তারিত বিবরণসহ শাওয়ালের রোযার ফযীলত জানাতে চাই।***

আবু হানিফ, চান্দিনা, কুমিল্লা।

জবাব: হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আগে রমাযানের ক্বাযা সিয়াম পূর্ণ করতে হবে। তারপর শাওয়ালের সিয়াম রাখতে হবে– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৪৭)*। যদিও রমাযানের ক্বাযা আদায় করতে পুরো শাওয়াল মাস চলে যায়– *(মাজমূউল ফাতাওয়া- ইবনু বায, ১৫/৩৮৮; মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়ার রাসায়েল- ইবনু উসায়মীন, ২০/১৮; জামে' তুরাসীল- আলবানী, ১০/২৬৪)*। তাছাড়া ফর্‌য সর্বদা নফলের উপর প্রাধান্য পায় এবং মহান আল্লাহর ঋণই আগে আদায় করতে হয়। কারণ বান্দা মারা গেলে তাকে আগে ক্বাযা সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, শাওয়ালের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৬৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৪১৩, সনদ সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩৩০)*। সুতরাং চেষ্টা করবে আগে ক্বাযা সিয়ামগুলো আদায় করে নিতে তারপর সম্ভব হলে শাওয়ালের সিয়াম রাখবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

'যে ব্যক্তি রমাযান মাসের সিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল (অর্থাৎ- সে সারা বছর সিয়াম পালনের সাওয়াব অর্জন করল)'– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৪)*। অন্য হাদীসে বলেন,

صِيَامُ شَهْرِ رمضانَ بِعشْرَةِ أَشْهُرٍ و صِيامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعدَهُ بِشهْرَيْنِ فذلِكَ صِيامُ السَّنةِ.

'রমাযান মাসের সিয়াম সমান দশ মাসের সিয়াম এবং এরপর ছয় দিনের সিয়াম সমান দুই মাসের সিয়াম। এভাবেই এক বছরের সিয়াম পূর্ণ হয়'– *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৪৬৫; আদ্ দারিমী- হা. ১৭৫৫; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১০০৭)*। আরবীতে ৩৬০ দিনে এক বছর হয়। অন্যত্র এসেছে,

جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها الشهرُ بعشرةِ أشهرٍ و صيامُ ستةِ أيامٍ بعد الشهرِ تمامُ السَّنةِ.

'আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজের সাওয়াব ১০ গুণ বৃদ্ধি সহকারে দিয়ে থাকেন। সুতরাং এক মাসের সিয়াম সমান দশ মাসের সিয়াম আর ছয় দিনের সিয়াম সমান দুই মাসের সিয়াম। এভাবেই এক বছর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।' *(সহীহ আত-তারগীব- হা. ১০০৭; সহীহ জামি'- হা. ৩০৯৪; ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- ফাতাওয়া নং- ৭৮৫৯)*

জিজ্ঞাসা (০২): ***উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল তিনি তার পরিবারের সদস্যদের শাওয়াল মাসে বিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন। আমি জানতে চাই শাওয়াল মাসে বিয়ে দেয়া বা করা কি সুন্নাত?*** *সুমাইয়া আক্তার, লক্ষীবাজার, ঢাকা।*

জবাব: শাওয়াল মাসে বিবাহ করা সুন্নাত এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ শরী'আতে বিশেষ কোনো মাস বা দিনকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে হয়েছিল শাওয়াল মাসে। 'উরওয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فِيْ شَوَّالٍ وَبَنَى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَأَيّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ؟

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার বাসর করেছেন। সুতরাং তাঁর নিকটে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে?' *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩১৪২)*

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র এ কথার উদ্দেশ্য হলো– জাহেলী যুগের মানুষের এই ধারণা ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠান অশুভ ও অকল্যাণকর। তিনি এ কথার মাধ্যমে এ ভিত্তিহীন ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। *(শারহে সহীহ মুসলিম- ৯/২০৯ পৃ.)*

বাস্তবতা হলো– রাসূল (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে যেমন শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন তেমনি অন্যান্য মাসে অন্যান্য স্ত্রীদেরকে বিয়ে করেছেন। যদি শাওয়াল মাসে

বিয়ে করা সুন্নাত হত, তাহলে সবগুলো বিয়ে তিনি এ মাসে করার চেষ্টা করতেন বা উম্মতকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। আর সাহাবীগণও এ মাসেই বিয়ে করার চেষ্টা করতেন। যেহেতু তারা ছিলেন সুন্নাহ পালনে সবচেয়ে অগ্রগামী। কিন্তু হাদীসে এমন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লা-হ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)'র উক্ত হাদীসের আলোকে শাফে'য়ী মাযহাবের বরাতে এ মাসে বিয়ে করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু অন্য মুহাদ্দিসগণ তার জবাব দিয়েছেন। যেমন- ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

حُكمٌ شرعيٌّ يَحتاجُ إلى دليلٍ، وقد تزوَّجَ (ﷺ) بنسائهِ في أوقاتٍ مُختلفةٍ على حَسَبِ الاتفاقِ، ولم يَتحرَّ وقتًا مخصوصًا، ولو كان مُجرَّدُ الوقوعِ يُفيدُ الاستحبابَ لكان كُلُّ وقتٍ من الأوقاتِ التي تزوَّجَ فيها النبيُّ (ﷺ) يُستحبُّ البناءُ فيه، وهو غيرُ مُسلَّمٍ.

'এটি একটি শরঈ বিধান, যার পক্ষে দলিল প্রয়োজন। নবী (ﷺ) ঘটনাচক্রে বিভিন্ন সময়ে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করেছেন। তিনি বিশেষ কোনো সময় অনুসন্ধান করেননি। শাওয়াল মাসে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর সাথে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার কারণেই যদি এ মাসে বিয়ে করাকে মুস্তাহাব বলতে হয়, তাহলে নবী (ﷺ) অন্য যত সময় বিয়ে/বাসর করেছেন সেগুলোকেও মুস্তাহাব বলতে হবে। কিন্তু এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।' *(নায়লুল আওত্বার- ৬/২২৫ পৃ.)* সুতরাং স্পষ্ট হলো যে এ মাসে বিয়ে করা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব নয়।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***মুকিম অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায কি একত্রে জমা করে আদায় করা যায়? তাছাড়া কোন কোন পরিস্থিতিতে নামায জমা করে আদায় করা যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

রেজাউল ইসলাম, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব: ভীতি ও ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোনো বিশেষ শারঈ কারণ থাকলে মুক্বীম অবস্থায় দু'ওয়াক্তের সালাত ক্বসর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে আদায় করা যায়। এক্ষেত্রে যোহর ও 'আসর পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে চার রাক'আত চার রাক'আত করে সুন্নাত ও নফল ছাড়া মোট আট রাক'আত আদায় করবে এবং মাগরিব ও 'ইশা অনুরূপভাবে তিন ও চার রাক'আত মোট সাত রাক'আত আদায় করবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়।' *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৭৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩৩-৩৪)*

জিজ্ঞাসা (০৪): ***মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কি সিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে? তাছাড়া রমাযানের সিয়ামের ক্বাযা কিভাবে আদায় করবো, দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।***

আম্মার, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা।

জবাব: নাফি' (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে একজন মাইয়্যেত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যার উপরে রমাযানের অথবা মানতের সিয়াম বাকী ছিল। তার জবাবে তিনি বললেন, একজনের সিয়াম অন্যজন রাখতে পারে না; বরং তোমরা তার মাল থেকে প্রতিদিনের সিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) সাদাক্বাহ্ করো। *(বায়হাক্বী- ৪/২৫৪ পৃ., সনদ সহীহ; হিদায়াতুর রুওয়াত- আলবানী, হা. ১৯৭৭; য'ঈফাহ্- হা. ৪৫৫৭)*
ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'একজনের সলাত অন্যজন আদায় করতে পারে না, একজনের সিয়াম অন্যজনে রাখতে পারে না; বরং প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে এক মুদ (সিকি সা') গম সাদাক্বাহ্ করো– *(নাসায়ী কুবরা- হা. ২৯৩০, সনদ সহীহ; মির'আত- ৭/২৮ পৃ.)*। যদি তা মাইয়্যেতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। যদি সম্পদের পরিমাণ অনুরূপ না হয়, তবে তা পূরণ করা ওয়ারিসের জন্য ওয়াজিব নয়– *(মির'আত- ৭/৩২ পৃ.)*। সহীহুল বুখারী'র ভাষ্যকার আল্লামা 'আয়নী বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ইজমা' করেছেন যে, একজনের সলাত ও সিয়াম অন্যজন রাখতে পারে না। কেননা উভয়টিই দৈহিক 'ইবাদত– *(মির'আত- ৭/২৯)*। মির'আত মুসান্নাফ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সিয়ামের ক্বাযা অন্যের দ্বারা হয় না। কেননা এটি দৈহিক 'ইবাদত। অতঃপর হাদীসে বর্ণিত,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

'মাইয়্যেতের পক্ষে তার উত্তরাধিকারী সিয়াম রাখবে'– *(মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৩৩)*। এর অর্থ মান্নতের সিয়াম– *(ঐ- ৭/৩১ পৃ.)*। উত্তরাধিকারীদের জন্য এটি অপরিহার্য নয়, তবে জায়িয। যদি তারা মনে করে– *(মির'আত- ৭/২৭)*। এর পক্ষে তারা হাদীস এনেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ.

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার উপরে সিয়াম বাকি রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী সিয়াম রাখবে, যদি সে চায়'– *(আত-তালখীসুল হাবীর- বাযযার, হা. ৯২৪, সনদ য'ঈফ)*। মির'আত মুসান্নাফ বলেন, যারা সওম ওয়াজিব নয়; বরং জায়িয বলেন, তারা উক্ত হাদীস থেকে দলিল নিয়ে থাকেন– *(মির'আত- ৭/২৮)*।

ইমাম শাওকানী ও মির'আত ভাষ্যকার প্রকাশ্য হাদীসসমূহের আলোকে মাইয়্যেতের পক্ষে তার ক্বাযা বা মানতের সিয়াম পালন করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন– *(মির'আত- ৭/২৮, ৩২, ৩৪ পৃ.)*। হাসান বাসরী (২১-১১০ হি.) বলেন, 'যদি মাইয়্যেতের পক্ষ হতে ৩০ জন ব্যক্তি একদিন সিয়াম রাখে, তবে সেটি জায়িয হবে'– *(সহীহুল বুখারী- তা'লীক্ব 'সওম' অধ্যায়- ৩০, অনুচ্ছেদ- ৪২)*। আর যদি তার উত্তরাধিকারীরা ফিদ্ইয়া দেয়, তবে একই দিনে ৩০ জন মিসকীনকে জমা করে পেট ভরে খাইয়ে দিবে। যেমন- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে গোশ্ত-রুটি খাইয়েছিলেন– *(ইরওয়া- হা. ৫২৪, সনদ 'সহীহ')*।

মূলত দৈহিক 'ইবাদত নিজেকেই করতে হয়। এগুলো জীবদ্দশায় যেমন- অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃত্যুর পরেও তেমনি অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। এগুলোর সওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ"– *(সূরা আত্-তূর: ২১)*। তিনি আরো বলেন, 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে'– *(সূরা আন্-নাজম : ৩৯)*।

জিজ্ঞাসা (০৫): ***কাউকে মসজিদ কমিটির সদস্য করার জন্য তার কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে বা তার গুণাবলী কি হবে জানতে চাই।*** *নাজমুল হাসান*
কামাল কাঠি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: মসজিদ আবাদকারীদের গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ﴾

অর্থ- "যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না– তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে"– *(সূরা আত্-তাওবাহ: ১৮)*। অতএব মসজিদ কমিটির সদস্যদের উপরিউক্ত পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য গুণাবলি থাকা আবশ্যক। যেমন- শিরক ও বিদআতের অনুসারী না হওয়া এবং আমানতদার হওয়া।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন দিবস, আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন মানতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে বাধ্য করা হচ্ছে; এমতাবস্থায় সে প্রতিষ্ঠানে চাকুরি ও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো যাবে কি?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন অতীব স্পর্শকাতরও বটে। কুরআন ও হাদীসে বিষয়গুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য জরুরি কর্তব্য হলো, সে তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সকল বিষয় হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

অর্থ- "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।" *(সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬)*

জিজ্ঞাসা (০৭): ***মহিলারা মাসিক অবস্থায় মোবাইল স্পর্শ করে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে কি?***
নাজমুন নাহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

জবাব: অপবিত্র অবস্থায় নারী-পুরুষ সকলের জন্যই কুরআন স্পর্শ করা হারাম। মাসিক অবস্থায় নারীরা যেহেতু অপবিত্র থাকে সেহেতু সেই অবস্থায় মহিলাদের কুরআন স্পর্শ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেনো কুরআন স্পর্শ না করে। তবে হাতমোজা, পরিচ্ছন্ন কাপড় কিংবা অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে আড়াল করে কুরআন স্পর্শ করা তাদের জন্যও বৈধ। বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা আরবী যে কোনো দু'আ পড়া বৈধ। কারণ মোবাইলের মনিটর কুরআনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা কেবলমাত্র ভাসমান প্রতিচ্ছবি। আর উভয়ের মাঝে তো তখন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। –ওয়াল্লাহু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***আমরা জানি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। কেউ কেউ বলেন, সিকি আনা পরিমাণ স্বর্ণ পরা না কি জায়িয? এ ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ দলিল আছে কি, যা ব্যবহার হালাল বা বৈধ সাব্যস্ত করবে? অনুগ্রহপূর্বক প্রমাণসহ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।***
রকি আহমাদ, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

জবাব: পুরুষের জন্য কম-বেশি স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

"আমার উম্মাতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে। আর উম্মাতের পুরুষদের উপর তা হারাম করা হয়েছে।" সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (ﷺ) একজন পুরুষের হাতে স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন:

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

"তোমাদের কেউ জাহান্নামের আগুনের কয়লায় পুড়তে ইচ্ছে করলে সে যেনো এটা (স্বর্ণের আংটি) তার হাতে পরে।"

এসব বলিষ্ট প্রমাণ থাকার পর যদি কেউ বলে যে, সিকি পরিমাণ স্বর্ণ পুরুষের জন্য জায়িয, তাহলে সে তাঁর নবী (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর নবী'র বিরুদ্ধাচরণ-এর পরিণাম জাহান্নাম।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***জনৈক 'আলেম এক মাহফিলে বলেছেন যে, ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা ও একে অপরকে ঈদ মুবারক বলা বিদ'আত। তাছাড়া এ ব্যাপারে তিনি চ্যালেঞ্জও ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের সঠিক ফায়াসলা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *আব্দুল গফুর*
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব: আলেমের এই বক্তব্য সঠিক নয়; বরং তা বিভ্রান্তিকর, মনগড়া ও ধারণা প্রসূত। সৌদী আরবের প্রখ্যাত 'আলেম আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু সালেহ আল উসাইমীন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: সাহাবায়ে কিরাম হতে পরস্পর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় প্রমাণিত। তিনি আরো বলেন তাছাড়া যদি মেনেও নেয়া যায় যে, তা প্রমাণিত নয় তদুপরি তা নিষিদ্ধ হবে না, কেননা সেটা 'ইবাদত গত কোনো বিষয় নয়; বরং সেটা আদত তথা অভ্যাস বা সামাজিকতা হিসেবে গণ্য সুতরাং তা অবৈধ হবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। অনুরূপ আল্লামা সালেহ আল ফাউযানেরও ফাতাওয়া রয়েছে তবে তিনি একথাও বলেন যে, ঈদ মুবারক বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় হতে হবে ঈদের দিন কিংবা ঈদ পরবর্তী সময়ে, কিন্তু ঈদের পূর্বে তা বলার কোনো প্রমাণ সালাফ থেকে আমার জানা নেই।

ইমাম ইবনু কুদামাহ্ আল মুগনী গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন- সাহাবী আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরাম ঈদের ময়দান হতে ফিরে এসে একে অপরকে বলতেন– "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম", অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের সবারটাই কবুল করুন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আবূ উমামার হাদীসটির সনদ উত্তম।

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, তখন থেকে মদীনাই এই প্রথা চলমান রয়েছে। সুনানে বাইহাক্বীতে ওয়াসিলাহ ইবনু আসকাহর বর্ণনায় নবী (ﷺ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। মূলতঃ উক্ত দু'আটি তৎকালীন যুগে ঈদের শুভেচ্ছার বিনিময় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুতরাং বর্তমান যুগেও যে কোনো শালীন ও ভদ্র শব্দ দ্বারা যেটা সমাজে প্রচলিত তা দ্বারা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অবশ্যই জায়িয তবে উক্ত দু'আটি ব্যবহার করা বেশি উত্তম হবে।

তাছাড়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, ঈদ মোবারক ও অনুরূপ বাক্য আদান প্রদান বৈধ যা কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম হতে প্রমাণিত। ইমাম আহমাদও এ মতের উপর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি বলেন: আমি প্রথমে কাউকে ঈদ মুবারাক জানাবো না তবে কেউ যদি আমাকে ঈদ মুবারাক বলে তাহলে আমি অবশ্যই তার শুভেচ্ছার উত্তর প্রদান করব।

জিজ্ঞাসা (১০): ***ঋতুবর্তী নারীদেরকেও রাসূল (ﷺ) ঈদগাহে গিয়ে দু'আয় শরীক হতে বলেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *সালমা ইসলাম*
পলাশ, নরসিংদী।

জবাব: ঈদের জামা'আতে ঋতুবতী নারীরাও উপস্থিত হবে মর্মে হাদীসটি নিম্নরূপ।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন: আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন, আমরা যেনো স্বাধীনা, ঋতুবতী ও পর্দানশীলা মহিলাদের দু'ঈদের দিন (ঈদগাহে যেতে) বের করি। যাতে তারা মুসলিমগণের জামা'আতে এবং তাদের দু'আতে শামিল হতে পারে। তবে ঋতুবতীগণ যেনো সলাত থেকে বিরত থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– তারা সলাতের স্থান থেকে আলাদা বসবে। তারা কল্যাণে এবং মুসলিমদের দু'আয় শরীক হবে। আমি [উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)] বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমাদের কারো (শরীর ঢাকার মতো) বড় চাদর নেই। নবী (ﷺ) বললেন, তার বোন যেনো তাকে তার চাদর পরায়।

"মুসলিমগণের দু'আয় শরীক হবে" –এর অর্থ হলো, খুৎবায় ইমামের নাসীহাত ও আম দু'আয় শরীক হবে। কেননা ঈদের সালাতের পর ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো 'আমল বর্ণিত হয়নি।

জিজ্ঞাসা (১১): ***ঈদগাহে যেতে বিলম্ব হলে ও ঈদের জামা'আত না পেলে করণীয় কি? এ বিষয়ে জানতে চাই।***
সিয়াম, রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

জবাব: ইমামের সাথে ঈদের জামা'আত না পেলে আপনি যথা নিয়মে দু'রাক'আত সলাত পড়ে নিবেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদের সলাত ইমামের সাথে না পেলে তার পরিবার-পরিজন ও অধীনস্তদের সাথে নিয়ে একত্রিতভাবে যথা নিয়মে ঈদের সলাত পড়ে নিতেন।

জিজ্ঞাসা (১২): ***বিশেষ প্রয়োজনে কোনো ঈদের সলাত মসজিদে পড়ার প্রয়োজন হলে "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" (দু'রাক'আত সলাত) পড়া কী আবশ্যিক? নাকি না পড়লেও চলবে? বিস্তারিত জানাবেন।*** *রাশেদ খান জয়পুরহাট।*

জবাব: দুই ঈদের সলাত এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত সাধারণভাবে উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হলে ময়দানে আগমন করে কোনোরূপ নফল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ সলাত আদায় শরী'আতসম্মত নয়। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ.

নবী (ﷺ) ঈদুল ফিতরের দিনে বের হলেন অতঃপর দু'রাক'আত ঈদের সলাত আদায় করলেন। সে দু'রাক'আতের পূর্বে ও পরে কোনো সলাত আদায় করেননি এবং তার সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

যদি ঈদায়নের সলাত কোনো মসজিদে আদায় করা হয় তবে মসজিদে প্রবেশ করে "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" দু'রাক'আত সলাত আদায় করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্য কোনো নফল সলাত আদায় করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমি একজন মুসলিম যুবক। রমাযানে একটি নির্দিষ্ট রুটিনে ছিলাম। রমাযান চলে গেলে মোবাইলের ফেইস বুক ইত্যাদিতে বেশ রাত কেটে যায়, ফলে প্রায়ই ফজর সলাত সময়মত পড়া মুশকিল হয়ে যায়। তবে আমি যখনই জাগ্রত হই তখনই ফজর পড়ে নেই। আমার জানার বিষয় হলো এ রকম হলে কি আমি পাপী হবো?*** *আরিফুল ইসলাম, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।*

জবাব: আপনি বলেছেন আপনি একজন মুসলিম যুবক, এটি আপনার জন্য বিরাট একটি সৌভাগ্য। অনেকটা উচ্ছন্ন যুব সমাজের মধ্যে আপনি ভালোদের কাতারে এটি সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে আপনাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে যে, ফর্‌য সলাত যথাসময়েই আপনাকে আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট সময় সলাত আদায় করা মু'মিনদের উপর অবধারিত।"

আপনি মোবাইলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দীর্ঘ রাত অতিবাহিত করে ঘুমাতে গেলে আর ফজর সলাত যথাসময় আদায় করতে না পারলে তা ইচ্ছাকৃত সলাতকে সঠিক সময়ে না পড়ার মধ্যে গন্য হবে। আপনার কথিত উযর এ ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না; বরং এভাবে সলাতকে নষ্ট করা হবে। মহানবী ইরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন 'আমল করে, যার স্বপক্ষে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" সুতরাং আপনার 'আমল সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। আপনাকে অবশ্যই আপনার বদঅভ্যাস ত্যাগ করে রাতে মোবাইল বর্জন করে আগে আগে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আপনি বিগত দিনগুলোর এ ধরনের বড় পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ্ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন: হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।"

জিজ্ঞাসা (১৪): ***আমি একজন সরকারী অফিসার। অফিসিয়াল দায়িত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততায় সন্তানদের প্রতি সময় দিতে পারি কম। সন্তানদের কেউ কেউ সলাতে অলসতা করে। সাধ্যমতো খোঁজ-খবর রাখি তাদের। আমার জিজ্ঞাসা হলো তাদের উদাসীনতার দায়ভার কি আমাদের অভিভাবকদের নিতে হবে?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: আপনার ব্যস্ততা ও কাজের চাপ যতই থাকুক না কেনো সন্তানদের অধিক যত্ন নেয়া, তাদের কাছ থেকে ভালো সবকিছু হাসিল করা এবং তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হতে হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীলতার বিষয়। সৎ সন্তান আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য, অন্যথা এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"

সন্তানদের সৎ কর্মশীল করে গড়ে তুলতে পারার মধ্যে বিরাট সাফল্য রয়েছে। আপনার জীবদ্দশায় এবং আপনার মৃত্যুর পর তারা আপনার জন্য দু'আ করবে। মহানবী ইরশাদ করেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার 'আমলের ছেদ ঘটে যায় তিনটি জিনিস ছাড়া: (১) সাদাক্বাহ্ জারিয়া, (২) উপকারী 'ইল্‌ম ও (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"

অভিভাবকদের অবহেলা এবং অযত্নের কারণে সন্তানদের কারণে তারা পাপী হবে এবং উপকার বঞ্চিত হবে।

সুতরাং দুনিয়াবী চাকুরী, সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে সন্তানদের প্রতিপালনে অধিক যত্নশীল হবেন। সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষনকালীন কিন্তু সন্তানাদি ইহ ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমার পিতা-মাতা বার্ধক্যজনিত অসুস্থ। তাদেরকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হয়, কিন্তু তারা তা করতে চান না। এ সময় যদি আমি তাদের কাউকেব ধমক দিয়ে ঔষধ খাওয়াই, তাহলে কী আমার অপাধ হবে? দয়া করে জানাবেন।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব: বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতা সন্তানের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সহনশীল আচরণ পাওয়ার শর'ঈ হক্বদার। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾

"আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না। আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও!"– *(সূরা ইস্‌রা: ২৩, ২৪)*। এ আয়তদ্বয় প্রমাণ করে যে, কোনো অবস্থাতে পিতা-মাতাকে ধমক দেওয়া যাবে না; বরং সেটি হারাম ও কবীরা গুনাহ। আপনি আপনার সবটুকু ভালোবাস উজাড় করে নম্র-ভদ্রভাবে বুঝিয়ে ওষুধ সেবন করাবেন। কোনো অবস্থাতে পিতা-মাতাকে ধমক দেওয়া যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখা কি মাকরূহ; যেমনটি কোন কোন আলেম বলে থাকেন?***

আব্দুল্লাহ আল-আমীন, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহান আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

আবূ আইয়্যূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমাযান মাসে সিয়াম রাখল, এর অনুবর্তীতে শাওয়াল মাসেও ছয়দিন সিয়াম রাখল– সে যেন গোটা বছর সিয়াম রাখল।" *(মুসনাদে আহমাদ- ৫/৪১৭; সহীহ মুসলিম- ২/৮২২; সুনানে আবূ দাউদ- হা. ২৪৩৩ ও সুনানে তিরমিযী- হা. ১১৬৪)*

এটি সহীহ হাদীস; যা প্রমাণ করে যে, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সুন্নত। ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমাদ ও একদল আলেম ও ইমাম এর উপর 'আমল করেছেন। এই হাদীসের বিপরীতে কোন কোন আলেম যে কারণগুলো উল্লেখ করে এই রোযাগুলো রাখাকে মাকরূহ বলেন সেসব সঠিক নয়। যেমন– সাধারণ মানুষ মনে করে বসবে যে, এগুলো রমাযানের রোযা, কিংবা কেউ এ রোযাগুলোকে ফর্‌য রোযা ধারণা করার আশংকা, কিংবা তাঁর কাছে এমন কোনো তথ্য পৌঁছেনি যে, পূর্ববর্তী কোনো আলেম এ রোযাগুলো রেখেছেন; ইত্যাদি অনুমান সহীহ সুন্নাহর মোকাবিলা করতে পারে না। আর যিনি জেনেছেন তিনি যিনি জানেন না তার উপর হুজ্জত (প্রমাণ)।

আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দিন।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***শাওয়ালের ছয় রোযা কি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রাখাটা সঠিক; যাতে করে আমি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার সওয়াবও পেতে পারি?***

লীমা আক্তার, জামালপুর।

জবাব: হ্যাঁ। রাখতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। এভাবে রোযা রাখলে আপনার জন্য ছয় রোযার সওয়াব এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার সওয়াবও লেখা হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি এই ছয়দিনের রোযা সোমবারে বা বৃহস্পতিবারে পড়ে তাহলে তিনি দু'টো সওয়াবই পেতে পারেন; যদি তিনি ছয় রোযার নিয়ত করেন এবং সোমবার বা বৃহস্পতিবারে রোযা রাখারও নিয়ত করেন। যেহেতু নবী (ﷺ) বলেছেন: "কর্মসমূহ নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি যা

নিয়ত করেন সেটাই তার প্রাপ্য”। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা-শাইখ মুহাম্মদ বিন উসাইমীন [রাহিমাহুল্লাহ-র], ২/১৫৪)*

জিজ্ঞাসা (১৮): ***শাওয়াল মাসের ছয় রোযা কি লাগাতারভাবে রাখা শর্ত না-কি আমি আলাদা আলাদাভাবে রাখতে পারি? কেননা আমি চাচ্ছি, প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিনে তিন ধাপে রোযাগুলো রাখতে?***

মনিরা বেগম, শীলমান্দি, নরসিংদী

জবাব: শাওয়ালের রোযাগুলো লাগাতরভাবে রাখা শর্ত নয়। তাই এ রোযাগুলো কেউ আলাদা আলাদাভাবে রাখুক কিংবা লাগাতারভাবে রাখুক এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় তত ভালো। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “তোমরা ভালো কাজে অগ্রণী হও।” আল্লাহ আরো বলেন: “তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে দ্রুত ছুটে আস।” মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেন: “আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।” *(সূরা ত্ব-হা-: ৮৪)* তাছাড়া দেরি করলে নানা বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। এটি শায়েফি মাযহাবের আলেমগণ ও হাম্বলি মাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত। কিন্তু, অবিলম্বে আদায় না করে মাসের মাঝখানে কিংবা শেষে আদায় করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম নববী বলেন: “আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: এ হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে শাওয়াল মাসের ছয় রোযা রাখা মুস্তাহাব। শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে লাগাতরভাবে রোযাগুলো রাখা মুস্তাহাব। আর যদি আলাদাভাবে রাখে কিংবা শাওয়াল মাসের পরে রাখে তবুও জায়িয হবে এবং এ সুন্নত পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে এ হাদীসের ব্যাপকতার কারণে। এ বিষয়ে আমাদের আলেমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। ইমাম আহমাদ ও দাউদও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।” *(আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব)*

জিজ্ঞাসা (১৯): ***ঈদুল আযহায় কুরবানী করার হুকুম কি? দয়া করে জানাবেন।***

হালিমা আক্তার ঘোরাশাল, নরসিংদী।

জবাব: সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ঈদুল আযহায় কুরবানী করা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। হানাফী মাযহাবেই কেবল কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়ার ফাতাওয়া রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) ছাড়া আর কোনো ইমাম কুরবানী করা ওয়াজিব বলেননি। তাই আমরা বলবো যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা সুন্নাত ও উত্তম। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক বছরই মদীনাতে কুরবানী করেছেন।

জিজ্ঞাসা (২০): ***একটি বাণিজ্যিক মার্কেটে আমার একটি দোকান আছে। আমার প্রতিবেশী দোকানগুলো তাদের দোকানের সামনের ফুটপাত ও রাস্তার কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে; যেটা দোকানের সীমানাভুক্ত নয়। বাধ্য হয়ে আমিও একটি অংশ দখল করে নিয়েছি। এটা কি হারাম হবে? যদি এটা গ্রহণ করা হারাম হয় তাহলে এই অংশের উপর আমি শুধু মালামালগুলো কি রাখতে পারি?***

আব্দুর রহমান, মেরীগাছা, নাটোর।

জবাব: ফুটপাতের কিছু অংশ দখল করা, এর উপর ভবন নির্মাণ করা এবং এটাকে দোকানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া; যেন এটা আপনারই মালিকানাধীন কিংবা আপনি নিজ মালিকানাধীন সম্পদে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেন এটাতেও সেভাবে হস্তক্ষেপ করা– এ ধরণের কাজ জায়িয নয়। এটি অন্যায়ভাবে অধিকারবিহীনভাবে জমি দখল করার পর্যায়ভুক্ত।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার অধিকার বহির্ভূতভাবে ভূমির কোনো একটি অংশ গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে সাত জমিনের নীচে দাবানো হবে।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৫৪)*

আর বেচাবিক্রির সময় কেবল ঐ স্থানের উপর মালামাল রাখাটা যদি মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রথায় ক্ষমার্হ হয় তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই; যদি এতে পথচারী ও ক্রেতাদের কোনো ক্ষতি না হয় এবং তাদের চলাচলের পথকে সংকুচিত না করে।

ইবনু কুদামা (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: “সড়ক, রাস্তা ও দালানের মাঝখানের গলিগুলো আবাদ করা (বুঝাতে চাচ্ছেন এর উপর নির্মাণ করা ও এ জাতীয় অন্যান্য তৎপরতা যা কেবল কোনো মালিক মালিকানা বলে করতে পারে)-র অধিকার কারো নেই; সেটা প্রশস্ত হোক; কিংবা সংকীর্ণ হোক; সেটা মানুষের জন্য সংকুচিত করুক কিংবা না করুক। কেননা এ স্থানগুলো মুসলমানদের সম্মিলিত মালিকানাধীন এবং এর সাথে তাদের সকলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তাই এগুলোর বিধান তাদের মসজিদের মতো।

তবে প্রশস্ত হলে বেচাবিক্রির মতো কাজে এর উপর এমনভাবে বসা জায়িয হবে যাতে করে অন্য কারো জন্য রাস্তা সংকুচিত না হয় এবং পথচারীদের ক্ষতি না হয়। যেহেতু সকল যুগের সকল শহর-বন্দরের মানুষ এমন বিষয়ে সম্মতি দেয়; আপত্তি করে না এবং যেহেতু এটি কারো ক্ষতি না করে বৈধ উপযোগিতা গ্রহণ করা; তাই যাতায়াতের মতো এতে কোনো বাধা নেই।” *(আল-মুগনী- ৮/১৬১)* মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জিজ্ঞাসা (২১): ***কোনো কোনো মসজিদে আমরা দেখতে পাই কিছু মুসল্লির জন্য চেয়ার রাখা আছে। এসব মুসল্লি চেয়ারে বসে ইমামের সাথে ফর্‌য নামায কিংবা তারাবীর নামায আদায় করেন। ইনাদের নামাযের হুকুম কী?***

মরজিনা বেগম, পাটেরবাগ, দনিয়া, ঢাকা।

জবাব: নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো নামাযের একটি রুকন। শরিয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি নামাযের তাকবীরে তাহরীমার শুরু থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত দাঁড়াবে না তার নামায বাতিল। আল্লাহতা'আলা বলেন: "তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৮)*

'দাঁড়ানোটা' নামাযের রুকন হওয়া ফর্‌য নামাযের জন্য খাস। নফল নামাযে দাঁড়ানো ওয়াজিব নয়; বরং বসে নামায পড়া জায়িয। কেউ যদি বসে নামায পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি অর্ধেক সওয়াব পাবে।

'দাঁড়ানোটা' ফর্‌য নামাযের সাথে খাস হওয়ার দলিল হলো নবী (ﷺ)-এর হাদীস: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়ো"। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০৬৬)*

নবী (ﷺ) তাঁর সওয়ারীর ওপর নফল নামায পড়তেন। যখন ফর্‌য নামায পড়তে চাইতেন তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৭০০)* তিনি এটি করতেন দাঁড়ানোর রুকন আদায় করা ও কিবলামুখী হওয়ার জন্য।

কারো দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকার পরেও সে যদি বসে নফল নামায আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসে এসেছে– "তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হাদীস বলা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক সওয়াব পাবে। কিন্তু আপনি তো বসে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: ঠিকই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মতো নই।" *(ইমাম মুসলিমের [হা. ৭৩৫] বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ)*

ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "এ হাদীসকে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায পড়ার অর্থে বুঝতে হবে। এমন নামাযী দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে, যদি দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে বসে নামায পড়েন সেক্ষেত্রে তার সওয়াব কম হবে না; বরং সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। আর দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি বসে বসে ফর্‌য নামায আদায় করলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সে কোনো সওয়াব পাবে না; বরং তার গুনাহ হবে।" *(শারহু মুসলিম- ৬/২৫৮)*

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী সেসব মুসল্লিগণকে বলব যারা ফর্‌য নামাযের জন্য দাঁড়ান না: যদি আপনাদের দাঁড়ানোর মতো সক্ষমতা থাকে তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা আপনাদের জন্য জায়িয হবে না; যদি না আপনাদের এমন কষ্ট হয় যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। সামান্য কষ্ট কোনো ওজর নয়।

মৃত্যু সংবাদ ও দু'আর আহ্বান

নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি ও রসুলপুর ওসমান মোল্লা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল এবং মাদ্‌রাসা মসজিদের সম্মনিত ইমাম শাইখ আতাউর রহমান মাওড়ী (রহিমাহুল্লাহ) ২৯ মার্চ-২০২৬, রবিবার, ভোরে ফজরের সালাতের ইমামতিরত অবস্থায় (স্ট্রোক করে) ইন্তেকাল করেছেন।

انا لله وانا إليه راجعون.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুমা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন -আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ

ইসতিকলাল মসজিদঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা

আবু ফাইয়ায

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা আল ইসতিকলাল মসজিদ যেন শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়। এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, স্বাধীনতার স্মৃতি এবং সহাবস্থানের প্রতীক। ব্যস্ত নগরের কোলাহল পেরিয়ে যখন কেউ এই মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তখন তার সামনে উন্মোচিত হয় এক বিশাল, শান্ত ও মহিমান্বিত জগৎ। সুউচ্চ মিনার, প্রশস্ত আঙিনা এবং বিশাল গম্বুজ যেন আকাশের সঙ্গে এক নীরব সংলাপ সৃষ্টি করে।

এই মসজিদের নাম "ইসতিকলাল", যার অর্থ স্বাধীনতা। নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর নির্মাণের উদ্দেশ্য। ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা অর্জনের পর একটি জাতীয় মসজিদ নির্মাণের চিন্তা করা হয়, যা স্বাধীনতার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়াবে। এই ভাবনার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ। ১৯৬১ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছরের প্রচেষ্টার পর ১৯৭৮ সালে মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

এই মসজিদের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এর স্থপতি Friedrich Silaban, যিনি একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। একটি মুসলিম জাতীয় মসজিদ নির্মাণে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অংশগ্রহণ ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তির শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

স্থাপত্যের দিক থেকে ইসতিকলাল মসজিদ আধুনিকতা ও প্রতীকবাদের এক অনন্য সমন্বয়। এর কেন্দ্রীয় গম্বুজের ব্যাস ৪৫ মিটার, যা ১৯৪৫ সালের স্বাধীনতার স্মারক। গম্বুজটি ১২টি বিশাল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রতীকবাদের সঙ্গে যুক্ত। মসজিদটিতে পাঁচ স্তরের নামাজের স্থান রয়েছে, যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরো স্থাপনাটি মার্বেল, স্টিল ও আধুনিক উপকরণে নির্মিত, যা একে একটি মিনিমালিস্ট অথচ মহিমান্বিত রূপ দিয়েছে।

মসজিদটির বিশালতা সত্যিই বিস্ময়কর। এখানে একসঙ্গে প্রায় দুই লাখ মানুষ নামায আদায় করতে পারে, যা একে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদে পরিণত করেছে। শুধু নামাযই নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। রমাযান মাসে এখানে প্রতিদিন হাজারো মানুষের জন্য ইফতারের আয়োজন করা হয়, যা এক অনন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ইসতিকলাল মসজিদের অবস্থানও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি জাকার্তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ঠিক পাশেই রয়েছে Jakarta Cathedral গির্জা। একটি মসজিদ ও একটি গির্জার এই পাশাপাশি অবস্থান বিশ্বে বিরল এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের এক শক্তিশালী প্রতীক। এই দুই উপাসনালয়কে যুক্ত করেছে "Tunnel of Friendship", যা পারস্পরিক সম্মান ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।

একজন দর্শনার্থীর দৃষ্টিতে এই মসজিদ শুধু একটি স্থাপনা নয়; বরং একটি অনুভূতি। সকালে সূর্যের আলো গম্বুজে পড়ে এক অপূর্ব সোনালি আভা তৈরি করে, আর সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় এটি হয়ে ওঠে আরও মায়াবী। ভেতরে প্রবেশ করলে বিশালতার মাঝে এক ধরনের নীরবতা ও আধ্যাত্মিকতা অনুভূত হয়, যা মানুষকে নিজের ভেতরের জগতে ডুব দিতে সাহায্য করে।

সবশেষে বলা যায়, আল ইসতিকলাল মসজিদ একটি জীবন্ত ইতিহাস–যেখানে স্বাধীনতার গৌরব, স্থাপত্যের সৌন্দর্য এবং মানবিক সহাবস্থানের শিক্ষা একসঙ্গে মিশে আছে। এটি শুধু ইন্দোনেশিয়ার নয়; বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনুপ্রেরণার প্রতীক।

তথ্যসূত্রঃ ১. Wikipedia – Istiqlal Mosque, Jakarta।
২. Indonesia Ministry of Religious Affairs / Indonesia Travel।

মৃত্যু সংবাদ ও দু'আর আহ্বান

উস্তাজুল আসাতিজাহ, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস নাজির বাজারের সাবেক কৃতি ছাত্র ও সুযোগ্য শিক্ষক এবং মাদ্‌রাসা মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক শিক্ষক, নাজির বাজার বাংলা দুয়ার জামে' মসজিদের সম্মানিত খাত্বীব, আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশের আমির শাইখ শামসুদ্দিন (সিলেটী) (রাহিমাহুল্লা-হু) দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় থেকে ২৭ মার্চ-২০২৬, শুক্রবার, ভোরে ইন্তেকাল করেছেন।

انا لله وانا إليه راجعون.

উল্লেখ্য যে, শাইখ শামসুদ্দিন (সিলেটী) (রাহিমাহুল্লা-হু) মাননীয় জমঈয়ত সভাপতিসহ অনেক বরেণ্য আলেমদের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন।

মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

৬৭তম বর্ষের ১৯-২০ সংখ্যা থেকে ২৫-২৬ সংখ্যা পর্যন্ত **সাপ্তাহিক আরাফাত পড়ুন** এবং **কুইজে অংশগ্রহণ** করে জিতে নিন **আকর্ষণীয় পুরস্কার**।

১. এক কথায় প্রকাশ:

ক) কোন কোন মাসকে হজ্জের মাস বলা হয়েছে?

খ) হজ্জ সম্পাদন করা ফর্‌য- কুরআনের দলিল দ্বারা প্রমাণ দিন?

গ) আরকানুল হজ্জ বা হজ্জের ফর্‌য কয়টি ও কী কী?

ঘ) কীভাবে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদক করতে হয়?

ঙ) হজ্জ সম্পাদনকালে কোনো একটি ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয় কী?

চ) হজ্জ সম্পাদনকালে উল্লেখযোগ্য নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী?

২. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক [✓] চিহ্ন দিন):

I. আরকানুল হজ্জ বা হজ্জের রুকনগুলো কী কী।

ক) নিয়ত করা, তাওয়াফ করা এবং আরাফায় অবস্থান করা।

খ) নিয়ত করা, সাঈ' করা এবং মুজদালিফায় অবস্থান করা।

গ) সাঈ করা, মিনায় অবস্থান এবং আরাফায় অবস্থান করা

ঘ) তাওয়াফ করা, তালবিয়াহ পাঠ এবং পাথর নিক্ষেপ করা।

II. হজ্জের রুকন ছুটে গেলে করণীয় কী?

ক) দম (কাফফারা) দিতে হয়

খ) মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়

গ) হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হয়

ঘ) হজ্জ কবুল হয়ে যায়।

III. তিনটি জামারায় মোট কয়টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়?

ক) ৭টি **খ)** ১৪টি

গ) ২১টি **ঘ)** ২৮টি

IV. তামাত্তু হজ্জকারীর উপর কুরবানী করার হুকুম কী?

ক) ফর্‌য (রুকন) **খ)** ওয়াজিব

গ) সুন্নাত **ঘ)** মুস্তাহাব

V. বিমানে গমনকারী বাংলাদেশি হাজীদের মীকাত কোনটি?

ক) যুল-হুলাইফা **খ)** আল-জুহফা

গ) কারনুল মানাযিল **ঘ)** ইয়ালামলাম

৩. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো (৫টি):

ক) নবী (ﷺ) ..... চক্করে কাবা প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতেন।

খ) হজ্জ সম্পাদনকালে নবী (ﷺ) ..... স্পর্শ/চুম্বন করতেন।

গ) মীনায় রাত্রি যাপন করা প্রত্যেক হজ্জ সম্পাদনকারীর উপর .....।

ঘ) সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ..... করা ওয়াজিব।

ঙ) .....-এর মাধ্যমে হজ্জের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

রেজিস্ট্রেশন ফরম

অংশগ্রহণকারীর নাম: ..... **বয়স:** .....

পিতার নাম: ..... **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** .....

পূর্ণ ঠিকানা: গ্রাম/এলাকা– ..... **ডাকঘর–** .....

থানা– ..... **জেলা–** ..... **মোবাইল নং-** .....

ই-মেইল (যদি থাকে)– .....

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **সাপ্তাহিক আরাফাত**-এর কুইজ প্রতিযোগিতার সকল শর্তাবলী আমি মনোযোগসহকারে পড়েছি এবং তা মেনে চলতে সম্মত।

অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর: ..... **তারিখ:** .....

মেধার লড়াই! **কুইজ প্রতিযোগিতা!!**

আসন্ন রমাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)

বর্ষঃ ৬৭, সংখ্যাঃ (১৯-২০) থেকে (২৫-২৬) মোট ০৪টি সংখ্যা

কুইজ প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

১. এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদান করতে হবে না। তবে নির্ধারিত ০৪টি সংখ্যা ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৬-এর মধ্যে অর্ডার করতে হবে। **অর্ডারের জন্য যোগাযোগ– ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, ০১৮৬৪১৩১৫১৮**।

২. অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ফেসবুক পেজে প্রকাশিত গুগল ফরম পূরণ করতে হবে।

৩. পবিত্র রমাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নগুলো সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৭ বর্ষের (১৯-২০) সংখ্যা থেকে (২৫-২৬) সংখ্যা পর্যন্ত মোট ০৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

৪. প্রতিটি সংখ্যার শুরুতে মণির খনি বিভাগে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রদান করা হবে। মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে কুইজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

৫. প্রতিযোগীকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য পৃথকভাবে উত্তরপত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং একই ব্যক্তির একাধিক উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা ভুল তথ্যসংবলিত ফরম বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. পত্রিকায় প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ফরমের নির্ধারিত অংশটি যথাযথভাবে ছিঁড়ে প্রতিটি উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পৃথক সাদা কাগজে স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হস্তাক্ষরে উত্তর লিখে পাঠাতে হবে।

৭. চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত সকল কুইজের উত্তর একসাথে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ এপ্রিল-২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে অথবা সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন বিভাগে পৌঁছাতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফরম ঐ সংখ্যার উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৮. প্রতিযোগিতার চারটি সংখ্যার মধ্যে কোনো একটি সংখ্যায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীকে চূড়ান্ত প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

৯. কুইজ মূল্যায়ন, বিজয়ী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বলে গণ্য হবে।

১০. বিজয়ীদের নাম ও পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এ প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে প্রতিযোগিতার যেকোনো শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ

প্রথম পুরস্কার	:	১ জন– ১৫,০০০/- টাকা।
দ্বিতীয় পুরস্কার	:	২ জন– প্রত্যেককে ৭,০০০/- টাকা।
তৃতীয় পুরস্কার	:	৩ জন– প্রত্যেককে ৫,০০০/- টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার	:	১০০ জন বিশেষ উপহার।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা বহু গুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

সূরা আল হাদীদ- ১১

নিশ্চয়ই সাদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে এবং মন্দ মৃত্যু দূর করে।

সুনান তিরমিযী- ৬৬৪

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

▪ আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ ▪

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (IIUSTB) পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত